শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র

ঐতিহাসিক কাহিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্চ ৩০, ১৮৯৯ - সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭০) একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক । তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে। তাঁর রচিত প্রথম সাহিত্য প্রকাশিত হয় তাঁর ২০ বছর বয়সে, যখন তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে আইন নিয়ে পড়াশুনো করছিলেন। পড়াশুনোর সাথেই তিনি সাহিত্য চর্চাও করতে থাকেন। তার সৃষ্টি গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩২ সালে। শরদিন্দু ১৯৩৮ সালে বম্বের বম্বে টকিজ এ চিত্রনাট্যকাররূপে কাজ শুরু করেন। ১৯৫২এ সিনেমার কাজ ছেড়ে স্থায়ীভাবে পূনায় বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তী ১৮ বছর তিনি সাহিত্য চর্চায় অতিবাহিত করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

অমিতাভ

০১.

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; বলিবে—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু স্যর অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়সড় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত,–সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানী, বিদ্যা এন্ট্রাস পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাস পাইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা! দু হাজার বৎসর, না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর! ছিয়াত্তর টাকা মাহিনীর রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আরশিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেনরাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গপ্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তারপর—কিন্তু যাক সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি–অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ-স্থান আমার চিরপরিচিত; একবার নাহে——শত সহস্রাবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তুপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল; দূরে ঐ স্থানে মহাধানিক সুবর্ণদত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যেদিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সেদিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশি হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠ মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে সে বলিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা-হরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়া লই–আমি জাতিস্মর! মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্পপরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা! আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্রশোভার জন্য এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী-রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নবপত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী—মূর্তি দেখিতেছেন,

তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্বপ্রধান রূপোপজীবিনী, বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাত। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসুচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া এই যক্ষিণী-মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও, এই কেরানী জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধুম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্কশয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে।—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে; তারপর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয়। যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, একালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশি ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবি করিত, ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম্র-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

“আসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—”

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে একদিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম–তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম-আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

০২.

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কৌশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু। কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন——বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, শত্রু দুই দিকে—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; কৌশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধরাজ্যের অন্তপাল সামন্ত রাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিলিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়েছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

একদিন, বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে–অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশি; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব, ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নামী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না-জানা পর্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্বত্রই ঘুরিতেছে; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি, সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নিবপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিক সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিক? এত রাত্রে?"

এই রাজ-সম্মানিত মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দেবী, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা

হইয়াছে?”

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম-উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্মকোরক। সহাস্যে বলিলেন, “বৎস্য, অদ্য সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীর পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।”

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, “তার পর?”

পরিব্রাজিক বলিলেন, “কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, “এই নিমাল্য শ্রেণিনায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে।”

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।”

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিক বিদায় লইলেন। আমি নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি—কুলি-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক। আমার উপর রাজ-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময়ভাবে পড়িল কেন? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মতো দীনের কুটিরে পদধূলি দিলেন কি জন্য? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই, তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে, কারণ বেশভূষায় একটু শিল্প-চাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢ়বদ্ধ। দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, “বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।” সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীড়ে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীপবর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্নসকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—“অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র-কুট্মল।” লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত! আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিটখিটে, কি জানি যদি না-জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে

হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে। কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই–স্বেচ্ছায় না। যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নিবপিতদীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পথিপার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাকরোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ! আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে এই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি, নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুট্মল।"

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুদূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূর লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ-ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায়?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝতে না পারিয়া তাহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পঠাইয়া তারপর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী–তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদগ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে যাতায়াত করা?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "একবার মাত্র গিয়ছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।"

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমাগ্নের মতো বসিয়া আছেন; আমি আর একটি প্রশ্নের বাজাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে?"

"সর্বসুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধার?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম–পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন। এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমে এক ঔদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন

দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কোশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনালেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম; মালমসলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়; তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থিররাশিতে আছেন; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেই দিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই।"

"যথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রুরাজ্যে দুর্গনিমাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া কাল গঙ্গা-শোণ-সংগমে যাত্রা করিবে। এমনভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গনির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও, তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোনও বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।"

আমি বলিলাম, "যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের রসদ কোথায় পাইব?"

মন্ত্রী বলিলেন, "গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।"

তারপর ঊষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন,

“শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ আতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসন্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।”

তাই ভাবি, কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-রচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুঞ্জিতা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্পদ ছিল নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার নায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

০৩.

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, নৃত্যুনাধিক এক দিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তারপর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে অতিপ্রত্যুষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্‌ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ

হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিকগণ অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত; নট-কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে গোপনবোতা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দাসু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা কচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথী তীর পর্যন্ত মগধের সীমা।–সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্রু শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি-শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চিৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধুনির ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর—মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুই জন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

একজন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে?"

সে ব্যক্তি স্থিরনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরকে হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি। জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ-দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজনগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম, "আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি; কার্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন।"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রশ্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদ্দর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি। তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লয়াছেন, তাঁহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার, জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, আমি সন্নাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, "ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।"

মিহিরামিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "কোন লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃকপাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসী ইতস্তত করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে!" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায়?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে? ভালো। কোন নক্ষত্রে?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুলানেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিকগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোরকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরামিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-বৃহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে এক কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভান করিয়া কিছু বেশি উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল, "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না...উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল..." এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে এক পত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জল পানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জাল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জল পান করতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে কহিল, ‘‘আমি জল পান করিব না।’’

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ‘কি হইল, কি হইল’—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। ‘কি হইয়াছে?’ ‘কেন এরূপ করিতেছি?’–এই প্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলিসংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধদণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করুস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসানিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁক্ড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মিকদল সন্ন্যাসীর দেহ শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিক-ব্যূহ ঠেলিয়া কর্মিক-জ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্‌নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া সকলের দিকে ফিরিয়া পরুষ-কণ্ঠে কহিল, ‘‘ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি—মৃত্যু; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টিসাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতিমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।’’

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল। তারপর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কুপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া আমরা বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গল পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ-সর্বসাকুল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক–বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব গোধূম চণক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকেরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযুথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সম্বৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোনও কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিকদল যে যেখানে পারিল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রাণহস্তীর পৃষ্ঠে স্তুপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়ের জন্য নদীসংগমে গেলাম। বিষায় কুলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, শোণি স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেন-পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল দ্বিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যে, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম। যে, এই দ্বিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

০৪.

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তীসকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিকপ্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহু-যুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, “নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত; আজ দুর্গারম্ভের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিরূপ দৈবকার্য?”

দিঙ্‌নাগ বলিল, “ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? সেই ভণ্ড তপস্বী— আজি তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।”

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, “ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রু নিপাত ও দেবতুষ্টি একসঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে?”

দিঙ্‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, "তুমি চিরদিন প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।"—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নীচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরযাগ সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্যও তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে!"

"ফাঁকি দিয়াছে!"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায়?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে! রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না! পাছে আমাদের একটু উপকার হয়, তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এদিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব!... নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পঠাইয়াছেন।"

এত সহজে যে বলি-সমস্যর মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

সর্বসুদ্ধ চারি-পাঁচটি ভিখারী,—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র,— আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্থ;— কেবল একটি বৃদ্ধ,–বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক

অদম্য বাষ্পোচ্ছাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদৃতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল—"অমিতাভ! অমিতাভ!"

আমি বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। আদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুনা নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইহারই উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন,–ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ! মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায়, মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখা নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল, কি পাইয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলাম!

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম, "অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।'

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না, শ্রীমন্‌, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্য জ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক। আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীবাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদগতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ–দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুরপ্রকৃতি দিপ্তনাগ-গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে

লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন ঊষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্যবাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন, ‘‘পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—এ কথা স্মরণ রাখিও।’’

বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম, ‘‘শাস্তা, আবার কত দিনে সাক্ষাৎ পাইব?’’

সেই হিমবিদ্যুতের নায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, ‘‘আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।’’

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, ‘‘আমি দেখিতেছি, তোমার এই কীর্তি বহু-সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।’’

এই বলিয়া, পুনর্বার আমাকে আশীবাদ করিয়া, দিব্যদশী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন ।

শেষ

চুয়াচন্দন

পর্ব ১

একদিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনোও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।
ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত—এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঠা প্রায় সেকালের সাধারণ রাজপথের মতো চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দু'-এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে-ডিঙ্গি, দুই-একটা হাজারমনী মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য চলিতেছে,—ছই ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।
বহুজনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘাটের জনতাকে সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও পৌঢ়া-বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশি। ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক ব্যবস্থা নাই, যে সেখানে পাইতেছে সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ্ টুপ্ ডুব দিতেছে। পর্দাপ্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতারক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙালী মেয়েদের দেহলাবণ্য গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশি প্রবল ছিল না; গৃহস্থ-কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবত আমাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখনও স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষী করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই—বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত মলামাটি সেই পুত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর পূর্বাহ্নে বাংলার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে একদল উলঙ্গপ্রায় পণ্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ববিদ্যায় পারংগম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙালী পণ্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশি ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়া-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্কও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ ইওরিবে উপক্রম করতেছিল। একজন অতি গৌরকান্তি যুবা—বয়স বিশ বছরের বেশি নয়—তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক একসঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিল। কয়েকজন বর্ষীয়াণ্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নামিয়া পূর্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণ দিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবন্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীরদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুইটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর একজন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদসঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া

উঠিয়াছিল।
হঠাৎ তীর হইতে একটা গেল 'গেল গেল' রব উঠিল। যে গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"
কয়েকজন সমস্বরে উত্তর দিল, "কানা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে-ভোলা মানুষ, হয়তো নৌকার ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।"
যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল, "তোমরা কেউ জলে নেমো না, তাহলে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।"—বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ল।
গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে—তারপর কাদা। এখানে বুক পর্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুবজল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তারপর অথৈ জলে গিয়া ডুব দিল।
কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখের উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েকজন পৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ সুরে হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।
পঞ্চাশ গুণিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বার-কয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।
এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল; একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।
সকলে সচিৎকারে প্রশ্ন করিল, "পেয়েছ? পেয়েছ?"
যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বলিতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"
যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্টি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহসমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।
কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শিরোমণি মশায়, বলুন দেখি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে?"
শিরোমণি এক চক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কে—নিপাতনে সিদ্ধ? ডুবে গিয়েছিলুম—না? তুমি বাঁচালে?" যুবককে শিরোমণি মহাশয় 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল; কূটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল।
কাণভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শরীরে বল নাই; কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি—এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই, এ কথা যে বলে, সেতৎক্ষণাৎ প্রমাণ করে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজিকর যত কৌশলী হোক, নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে অক্ষম; মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করিতে পারে না।"
নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল, "যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—এখন উঠতে পারবেন কি?"
শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধরে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না?"
নিপাতন বলিল, "উঁহু। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয়নিশান।"
"সে কি?"

“আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা। ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।”
“জ্যাঠা ছেলে।”
“আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি—সত্যি কথা।—কিন্তু সে কথা হোক, একলা বাড়ি ফিরতে পারবেন তো?”
“পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।” তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “বিশ্বম্ভর, এত দিন জানতাম তুমি নিপাতনে সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।”
নিপাতনে হাসিয়া বলিল, “কি সর্বনাশ! শিরোমণি মশায়, ও আশীর্বাদ করবেন না। তাহলে আমার ব্যাকরণ টোলের কি দশা হবে?”
ও-দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এ-সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল। স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা একজন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে; সিংহল, কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষমূর্তি আর কখনও দেখে নাই।
একজন জেলে-মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাপু, ঐ লোকটি কে জানো?”
জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল, “ঐ উনি? উনি নিমাই পণ্ডিত।”
যুবক ভাবিল—পণ্ডিত! এত অল্প বয়সে পণ্ডিত! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোনও সুবাদ ছিল না। সে বেনের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া সোনাদানা আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সে আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

পর্ব ২

বেনের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা; বয়স একুশ-বাইশ। বুদ্ধিমান্ম বাক্‌পটু, বিনয়ী—বেনের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী বাঙালী হইতে পৃথক। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা; স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কানে হীরার লবঙ্গ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে—মাঝখানে সিঁথি। গলায় সোনার হার বণিক্‌পুত্রের জাতি-পরিচয় দিতেছে। চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে বিলক্ষণ দু-পয়দা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত; তাই একদিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়াছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর দর্শনে চলিল। সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূর্ণ-বিপণিতে দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারু-খচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রানবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনায়াস মন্থরপদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল; কিছুদূর যাইবার পর একটা জিনিস দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল; সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়াছে; কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই—‘মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল’—এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকলে হয়তো ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেনের ছেলে, আত্মবিস্মৃতভাবে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহোক দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি একজন বয়স্কা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব-রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে; হয়তো এমনই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব করি তাঁহার রাই-কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃদকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে; তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি। দেহে একখানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দু’গাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভালো হয়।

সে যেন চারদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগতযৌবনা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। আঁটসাঁট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুইটা যেন সর্বদাই ঘুরিতেছে।
চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটা কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার মধ্যে যেন কিছু বলিবে মনে করিল। কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল।
চন্দনদাসও অমনি ফিরিল। তাহার নগর-ভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। 'গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি'—চন্দনদাসের যেটুকু সর্বনাশ হইতে বাকি ছিল, তাহাও এবার হইয়া গেল।
সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল, অগ্রবর্তিনী স্নানার্থিনীদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।
ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধ হয় গৃহে ফিরিতেছিলেন; ভিজা গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা ক্ষুব্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।
অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা" তাহার মনে আসিল না; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে মেয়েটি বেনের মেনে, তাহার স্বজাতি। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙাপাড় শাড়ি তাহার প্রমাণ। তবে ষোল-সতের বছরের মেয়ে বাংলাদেশে অবিবাহিত থাকে কি করিয়া?
কিন্তু সে যাহা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও তাহাদের পিছু লইল। চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্তমানকালে কিছু বর্বরোচিত বোধ হইতে পারে; কিন্তু একালের রুচি দিয়া সেকালের শিষ্টাচার বিচার করা সর্বদা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মতো হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাঁহার কাঁচা হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সেকালের ঠাকুর-দেবতারাও কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন, তাহা তো ভক্ত কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন।—"এ ধনি কে কেহ বটে!"
মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ-পথ হইতে ও-পথে কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরিব বেনেপাড়া। অধিকাংশ বাড়ির খড়ের বা খোলার চাল।
গলির মধ্যে কিছুদূর গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ির দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়িটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ির সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল, দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেনের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, চই ছোট ছোট ধামাতে সাজানো আছে; একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি করিতেছে। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। চন্দনদাস বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।
চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল। সে কোনও মতলব স্থির করিয়া উহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি

করিবে? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ি দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে? চন্দনদাস বাড়ির সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলসভাবে যাতায়াত করিয়া কর্তব্য স্থিত করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভালো চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে-কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমনভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।
সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল; মিঠা হাসিয়া বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভালো চুয়া আছে?"
যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল, তাহার দেহ-যষ্টিতে বিন্দুমাত্র রস না থাকিলেও প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দনদাসকে বাড়ির সম্মুখে অকারণ ঘুর্‌ঘুর্‌ করিতে দেখিয়া বুড়ি এই অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ি মুখ ছাড়িত; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মতো সাজ-পোশাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্টি হইয়াছিল।
চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আছে বইকি বাছা। এসো, বসো।"
চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া জলচৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, তোমাকদের বাড়িতে কি পুরুষুমানুষ নেই? তুমি নিজে বেসাতি করছে যে?"
বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা আর বলো না বাছা; একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয়?" তারপর কথা পাল্টাইয়া বলিল, "তা হ্যাঁ বাছা, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি, ন'দের লোক নও বুঝি?"
চন্দনদাস বলিল, "না, আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ।"
বুড়ি বলিল, "ও—তাই। কথায়-বার্তায় যেন বেনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।"
চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ি দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, "ও মান, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে গো—স্বজাত! আহা, যেমন সোনার কার্তিকের মতো চেহারা, তেমনি মা'র কোল জুড়ে বেঁচে থাকো।—কোথায় বিয়ে-থা করেছ?"
চন্দনদাস কহিল, "তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বৌ মরে যায়। তারপর আর বিয়ে করিনি।"
বুড়ি একটু বিমনা হইল; তারপর উৎসুকভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।
চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "সমুদ্রে গিয়েছিলাম আয়ি, দু'বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম ন'দেয় একদিন থেকে যাই' মা'র বরাত আছে চুয়া কেনবার, চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেন দেওয়ায়ো হবে।"
বুড়ি বলিল, "তা বেশ করেছ বাছা, ভাগ্যিস এসেছিলে তাই তো অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম।" বুড়ি একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত!
চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, তোমার আপনার জন কি আর কেউ নেই?"
"একটি নাতনী আছে, আর সব মরে হেজে গেছে। পোড়াকপালী ছুঁড়ির কপাল!"—বলিয়া বুড়ি আঁচলে চোখ মুছিল।
"নাতনী!"—চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল; তবে বুড়ির নাতনীকেই সে দেখিয়াছে।—"তবে তুমি বুড়োমানুষ দোকান দেখ কেন? সে দেখতে পারে না?"
বুড়ি উদাস আশাহীন সুরে বলিল, "সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে জাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে জন্মেছিল, ঐ রূপই ওর শত্তুর।"
চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার

আয়ি? সব কথা খুলেই বলো না।”
বুড়ি কিন্তু রাজী হইল না, বলিল, “কি হবে বাবা, আমাদের লজ্জার কথা শুনে? কিছু তো করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।”
“কে বললে, কিছু পারব না?”
“না বাবা, সে কেউ পারবে না।—আহা! সোনার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে!”—বলিয়া বুড়ি হঠাৎ মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।
চন্দনদাস বুড়ির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আয়ি, আমি বেনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল্।”
বুড়ি উত্তর দিবার পূর্বেই, বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া এই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কাঁদছিস কেন রে, বুড়ি? কি হয়েছে?”
বুড়ি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চখ মুছিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, “কিছু নয় রে চাঁপা—অমনি। এই ছেলেটি দূর-সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেক দিন পরে দেখলুম—তাই—“
চাঁপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ির উদ্দেশে বলিল, “হুঁ—নাতি!—তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিসনি তো?”
বুড়ি কম্পিতস্বরে বলিল, “বললুম না, দূর-সম্পর্কে। আমার পিসতুত বোনের—“
চাঁপা বলিল, “বুঝেছি।”—তারপর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল, “তোমাকে আজ পথে দেখেছি না?”
চন্দনদাস সটান মিথ্যা বলিল, “কই, না! আমার তো মনে পড়ছে না!”
চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, “তবে আমারই ভুল। বুড়ি, তুই তাহলে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক’—আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে তো? দেখিস, ছেড়ে দিসনি যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।”—বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।
চাঁপা দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, “এটি কে?”
বুড়ির তখনও হৃদ্‌কম্প দূর হয় নাই, সে বলিল, “ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল—এক্ষনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিসনি। ওরে, তুই আমাদের কি ভালো করবি? ভগবান আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি?”
চন্দনদাস বলিল, “সে কি ঠান্‌দি, নাতিকে কি এমনি করেই তাড়াতে হয়? একটা পান পর্যন্ত দিতে নেই? তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস? তুই কেমন বেনের মেয়ে?”
বুড়ি এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন?
বুড়ি মনে ভাবিল,—যা হয় তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?
তখন বুড়ি সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, “ও মা, সত্যি তো! চুয়ার কথা মনে ছিল না। তা দেব, দাদা—কিন্তু বড় নামী জিনিস, দাম দিতে পারবে তো?”
“দাম কত?”
“জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ সব দিলেও সে জিনিসের দাম হয় না।”
চন্দনদাস একটু অবাক হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল, “আচ্ছা, আগে জিনিস দেখি।”

"এই যে, দেখাই। ওলো ও চুয়া, একবার এদিকে আয় তো দিদি।"
চন্দনদাস তড়িৎস্পৃষ্ঠের মতো চমকিয়া উঠিল। তবে মেয়েটির নাম চুয়া! আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে! এ কি দৈব যোগাযোগ!
"কি বলছ ঠান্‌দি?"—বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মতো গাল দুটিতে কেন যেন কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া দিল। তারপর ম্রিয়মাণ লজ্জায় তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে; পথের ক্ষণিক-দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।
বুড়ি বলিল, "চুয়া, অতিথি এসেছে; একটু মিষ্টিমুখ করা, পান দে।"
চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ি বলিল, "আমার চুয়াকে দেখলে?"
"দেখলাম।"—আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙিল না। বুড়িও সে দিক দিয়া গে না, বলিল, "কেমন মনে হল?"
"মনে হল—" সহসা চন্দনদাস বুড়ির দিকে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠান্‌দি, চুয়ার কি বিপদ আমায় বলো। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন?"
দ্বারের নিকট হইতে জবাব আসিল, "কি হবে তোমার শুনে?"
এক হাতে ফুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারিখানি বাতাসা ও দুটি পান, অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পারিয়াছিল; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারের তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি? চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাদের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে তীব্র অধীর স্বরে বলিল, "কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে?"
ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল, "চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি; আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ আমি জানি না; কিন্তু আমি যদি তোমায় সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না?"
চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানি সাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্খা ও ক্ষণ-বিস্ফোরিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ?"—বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।
চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল; তারপর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পান দুটি মুখে পুরিয়া বুড়ির দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "ঠান্‌দি, এবার তোমার গল্প বলো।"
"বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।"
"কি?"
"তুমি ওকে উদ্ধার করবে?"
"করব। অন্তত প্রাণপণে চেষ্টা করব।"
"বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে পালাতে হবে। পারবে?"
"পারব—খুব পারব।"
"ভালো, কিন্তু তারপর?"
"তারপর কি?"
বুড়ি একটু দ্বিধা করিল; শেষে বলিল, "কিছু মনে করো না, সব কথা স্পষ্ট করে বলাই

ভালো। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাবে। তারপর?”
চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।
বুড়ি তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, “ওকে বিয়ে করতে পারবে?”
চন্দনদাসের চোখে সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল; সে উদ্ভাসিত মুখে বলিল, “পারব।”
“তোমার বাপ-মা—“
“তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।”
বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে বলিল, “বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভালো ছেলে। কিন্তু ছুঁড়ির যা কপালে —“
বুড়ি তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়ে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।
চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেনেদের মধ্যে সে বেশ সংগতিপন্ন গৃহস্থ ছিল; চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।
এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মাও মরিল। তখন বুড়ি ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ি কাঞ্চনদাসের মাসে—আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।
নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরাডুবি হইয়াছিল, কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ি দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।
এইভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।
এই সময় একদিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ির সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। দুর্দান্ত জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক তো দূরের কথা, কাজি সাহেব পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন—সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, স্বভাব তার চণ্ডালের মতো। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তারপর বাড়িতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ি ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্য্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর পর্যন্ত কুমারী থাকিবে, তারপর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধারণায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য সার্থক হইবে। সাধ্রক—স্বয়ং মাধব।
এই হুকুম জাতি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বণিক-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙিয়া গেল।
ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল—বারো বছর বয়স হইল। বুড়ি দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল। কিন্তু বুড়ির হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না; মাধবের কানে সংবাদ গেল।
মাধব আসিয়া বুড়িকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল; তারপর চুয়াকে পাহাড়া দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকাপদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়াছে। সে দুয়া ও বুড়ির উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বৎসর কাটিয়াছে। কয়েকদিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে—সেজন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এজন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবশ্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামাল্য ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধনস্থলে অর্থাৎ উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে। মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ কৃষনা চতুর্দশী—কাল অমাবস্যা।
গল্প শেষ করিয়া বুড়ি কাঁদিএ কাঁদিতে বলিল, "দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারো। তুমি ছাড়া ওর আর গরি নেই।"
গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, ঐ দানবপ্রকৃতি লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মতো তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যদি চুয়াকে বিয়ে করে কাল আমার নৌকোয় তুলেনিয়ে দেশে নিয়ে যাই—কে কি করতে পারে?"
দ্বারের আড়ালে চুয়ার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ি মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্ষুশী আছে—সে কখনই হতে দেবে না।"
চন্দনদাস বলিল, "চাঁপাকে সোনায় মুড়ে দেব। তাতে রাজী না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখব।"
বুড়ি কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর; কিন্তু বুড়ির প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে যেন হল, কিন্তু বিয়ে হবে কি করে? বিয়ে দেবে কে?"
"কেন—ন'দেয় কি পুরুত নেই?"
বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি মাধবকে জানো না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজী হবে না।"
চন্দনদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, "এখানকার বামুনেরা এত ভীরু?"
"কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা, যে জমিদারর ভাইপোর শত্রুতা করবে? তা—শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয় করেন না। বয়স কম কিনা!—কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন?"
চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠান্‌দি,—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাঁকে আমি আজ গঙ্গাঘাটে দেখেছি; ঠিক দেবতার মতো চেহারা—তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।—ঠান্‌দি, আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম। ওবেলা সব ঠক করে আবার আসব। তখন—"
"কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন?"
চন্দনদাস চিন্তা করিল, "যদি রাজী না হন—তিনি রাজী হোন বা না হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই।—নাই বা হল বিয়ে? আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি করে নিয়ে যাব। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করব—কি বলো?"
বুড়ির মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল; কিন্তু তবু—চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে একজন ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ি কি করিয়া জানিবে? বারবার দাগা পাইয়া বুড়ির মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্তত করিতে লাগিল।
এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয়-সংকোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ, অন্য দিকে সম্ভাবনা। চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি আজ রাত্তিরে এসো। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজী না হন, তবু, তোমার ধর্মের ওপর বিশ্বাস করে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"
চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময়

বাধা পড়িল।

পর্ব ৩

গলির মধ্যে দ্রুত অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চিৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরে দরজা বন্ধ কইরা দিল। বুড়ি থরথর করিয়া কাঁপিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেরি একজন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লাল রঙের কোর্তা, কোমরে তরবারি, মাথায় পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; কপালে প্রকাণ্ড একটা সুন্দূরের ফোঁটা। ফোঁটার নিচে বিশাল ভাঁটার মতো চোখ দুটাও প্রায় অনুরূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। ব্যস বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এমন দুষ্কার্য নাই—যাহা সে করে নাই; এমন মহাপাতক নাই—যাহা সে করিতে পারে না। এমন ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের দুর্দান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দালানের উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবকর্কশ ভয়ংকর সুরে মাধব প্রশ্ন করিল, ‘‘তুই কে?’’

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দম্ভস্ফীত মুখে একটা লাথি পারে; কিন্তু সে তাহা করিল না। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চিন্তাকার্য চলিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সব দিক রক্ষা হয়? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং অনিষ্ঠের সম্ভাবনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচকের কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, ‘‘সে খোঁজে তোমার দরকার কি?’’

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, ‘‘তুই এখানে কি চাস?’’

চন্দনদাস আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, ‘‘এই চাই।’’

এই নিরীহ-দর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড় দুঃসাহসিক কার্য একেবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়ল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব ষণ্ডের মতো গর্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার নাগালে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

পর্ব ৪

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবলমাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহারই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া বুড়িকে ধরিল; বুড়ির চুলের মুঠি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়িকে মারিলে হয়তো সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয়; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ির চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙ্গিনার মাঝখানে বুড়িকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, "হারামজাদী বুড়ি, ও ছোঁড়া তোর কে বল্।"

পূর্বেই বলিয়াছি, বুড়ি বুদ্ধিমতী; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে; সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ অর্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়িও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ি তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছামিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, অনেক মাথার দিব্য, চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না তাহাও বুড়ির অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কি, ঢাল; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্‌দী। ইহাদেরই বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থাভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।
বুড়িতে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধ হয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা যাহা বলিল, তাহাতে বুড়ির কথা সমর্থিত হইল। তা ছাড়া আধবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে বুড়ি মিথ্যা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "তোর নাতনী কোথায়?"
বুড়ি বলিল, "ঘরেই আছে, বাবা।"
মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, "দেখে আয়।"
চাঁপা দেখিয়া আসিলা বলিল, চুয়া ঘরের আছে বটে।
মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুইজন পাইককে বুড়ির বাড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল, "কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায়, তার গলায় সড়কি দিবি।"
এইরূপে বাড়ির সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরি না করিয়া আজই দুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্তে যে স্পর্ধিত বেনের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।
বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দার-পাইককে বলিল, "বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়া গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেনের নৌকো আটক কর্। আমি যাচ্ছি।"—বলিয়া আর একজন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।
বদন সর্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দু'খানি ভাগীরথীর বক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে; বহুপদবিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মতো তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

পর্ব ৫

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল—এখন কর্তব্য কি? প্রথমত, চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথে লইবে, অনুমান করা কঠিন; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে;

তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়ত, তাহার নৌকা বাঁচাইতে হবে। ক্রোধান্ধ মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে। মাধব রেয়াৎ করিবে না।
ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বত্থ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় গিয়া উঠিল; দেখিল, মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দার-মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, ''এখনি নৌকো খুলতে হবে।''
হতবুদ্ধি মাঝি বলিল, ''এখনি? কিন্তু—''
''শোনো, তর্ক করবার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকো খোলো—পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তারপর গাঙের মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আমি যতদিন না ফিরি সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে?
''আপনি সঙ্গে যাবেন না?''
''না। এখন যাও, আর দেরি করো না। যতদিন আমি না ফিরি সাবধানে নৌকো পাহারা দিও।''
''যে আজ্ঞা''—বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত পরে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পাল তোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডারে গিয়া কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইল। প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। যে-কার্যে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন কিছুই স্থিরতা নাই; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল্য সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইলা। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।
এ ছাড়া আরও দুইটি জিনিস চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপর সোনার কাজ করা ছোট ছোরা; এটি সে কোচিনে এক আরব বণিকের নিকট কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়, এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে শৌখীন স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এই কাঁটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বাস ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মাগ্র সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।
নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল। ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর, আশেপাশে দোকানের মধ্যে দোকানী নিদ্রালু; মধ্যাকাশ হইতে সূর্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছ-পালা পর্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে; মানুষ গৃহতলের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। কিছুদূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া চন্দনদাস এবার কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয়-দশ বছরের কটিবাসপরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রবীণের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ''সওদাগর! সমুদ্দুর থেকে আসছ—ন্যাঃ?''
বালকের ভাষা ও বাক্প্রণালী অতি অদ্ভুত—আমরা তাহা সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলাম।
চন্দনদাস বলিল, ''হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় জানিস?''
বালক বলিল, ''হিঃ—জানি।''
''আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।''
বালকের ধূর্ত মুখে একটু খানি হাসি দেখা দিল, সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, ''ডাংগুলি খেলছি যে।''
''পয়দা দেব।''
আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল, ''আগে দাও।''

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দক দিল, তখন দে আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।
বেশি দূর যাইতে হইল না' নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত একটা আবড়ি যষ্টি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল, চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, "তুই যদি আর একটা কাজ করিতে পারিস, তোকে চারটে পয়সা দেব।"
"কি?"
"কাঞ্চন বেনের বাড়ি জানিস?"
বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, "চুয়া? মাধায়ের কইমাছ? জানি।—হি হি!"
চন্দনদাসের ইচ্ছা হইলে, অকালপক্ক ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চুয়া। শোন্, তার বাড়ির সামনে দিয়া যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি?"
বালক বলিল, "হিঃ—পয়দা দাও।"
চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আগে খবর নিয়ে আসবি, তবে পয়সা পাবি। আমি এখানেই থাকব।"
বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ব্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।
চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা; ছাত্ররা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলে তুলতের একখানি নূতন পুঁথি; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন; প্রশান্ত বিশাল চক্ষু হইতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চান?"
চন্দনদাস বলিল, "নিমাই পণ্ডিতকে।"
"আমিই নিমাই পণ্ডিত।"
পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।
নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরেছেন?"
চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমিই।"
নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যা হোক, আপনি—?"
চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করজোড়ে বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।"
নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "বেশ, কি ব্যাপার বলো তো?"
চন্দনদাস বলিল, "একটা কাজে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি?"
নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর কোনও কাজ আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক্, প্রস্তাবটা কি শুনি?"
চন্দনদাসও হাসিল; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটুকথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি কাঞ্চন বেনের মেয়ে চুয়াকে জানেন?"
নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "জানি। চুয়ার কথা নবদ্বীপের সকলেই জানে।"
চন্দনদাস বলিয়া উঠিল, "তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না?"

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।
চন্দনদাস তখন বলিল, "আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি?"
নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুঁথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জানো কি?"
"যা জানি, আপনাকে বলছি।"—এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল; শেষে কহিল, "এই নির্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনি একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করিতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্বনাশ হয়।"
নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।
এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস সাগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিতেই সে বলিল, "চুয়ার বাড়ির সামনে দুটো পাক্ বসে আছে; যে যাচ্ছে তারে হুমকি দিচ্ছে।"
"আর কি দেখলি?"
"চুয়া আর তার ঠান্দি ঘরে আছে। চাঁপা নাপতিনী বুড়ির সাথে কোঁদল করছে।"
"আর কিছু?"
"আর মাধাই চন্নন বেনের ডিঙ্গি লুঠ করতে গেছে। পয়সা দাও।"
খুশি হইয়া চন্দনদাস বালককে চার পয়সার স্থলে দু'গণ্ডা দিল। হৃষ্ট বালক তীক্ষ্ণস্বরে একবার "উ—" বলিয়া উল্লাস জ্ঞাপনপূর্বক ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।
বালককে বিদায় করিয়া চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের দিকে ফিরিতেই তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার উদ্যম প্রশংসনীয়; আমরা গাঁয়ের লোক যা করিনি, তুমি বিদেশী তাই করতে চাও। তোমার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তাতে তোমার মহত্ত্বের কিছু মাত্র হানি হয় না; আমি কি করতে পারি বলো।"
চন্দনদাস বলিল "তা আমি জানি না। আপাতত পরামর্শ দিতে পারেন।"
"বেশ, এসো, পরামর্শ করা যাক। মাধব যে রকম দুর্ধর্ষ পাষণ্ড, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না। আমার মনে হয়—"
চন্দনদাস বলিল, "একটি নিবেদন আছে। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে; ব্রাহ্মণবাড়ি একটু পাদোদক পেতে পারি?"
নিমাই সচকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও আহার করোনি?"
চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "না, কেবল চুয়ার দেওয়া একখানি বাতাসা খেয়েছি।"
"কি আশ্চর্য! এতক্ষণ বলোনি কন? দাঁড়াও, আমি দেখি।"—বলিয়া খড়ম পরিয়া ত্বরিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।
বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য-পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, "একজন অতিথি এসেছে। খেতে দিতে পারবে?"
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পারব।" তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল-ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জন অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।
নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, স্মিতমুখে চন্দনদাসকে ডাকিতে গেলেন। এই নীরব কর্মপরায়ণা অনাদৃতা বধূটি ক্ষণকালের জন্য নিমাই পণ্ডিতের মন হইতে লক্ষ্মীদেবীর স্মৃতি মুছিয়া দিল।
অতঃপর চন্দনদাস পরিতোষপূর্বক ব্রাহ্মণগৃহে প্রসাদ পাইল।

পর্ব ৬

পরামর্শ স্থির করিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। যে সকল ছাত্র টোলে পড়িতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।
সংকল্প স্থির করিয়া নিমাই বলিলেন, "এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখি না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দলে টানতে ভয় করে; কথাটা জানাজানি হয়ে যদি মাধবের কানে ওঠে, তাহলে আর কোনও ভরসা থাকবে না।"
চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে?"
"অন্য ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে ব্যাপারে মাধব আছে, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব টের পেলে তারা আমাদেরকেই মাধবের হাতে ধরিয়ে দেবে।"
"তাহলে—"
নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাঝি-মাল্লার কাজ আমাকেই করতে হবে। কাণভট্টের আশীর্বাদ দেখছি এরি মধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে।"
চন্দনদাস বলিল, "চুয়াকে আমি খবর দেব। শেষ রাত্রির দিকে পাইকরা ঘুমিয়ে পড়বে—সেই উপযুক্ত সময়। কি বলেন?"
"হ্যাঁ, তুমি তোমার নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মাধব নিশ্চিন্ত থাকবে, হয়তো রাত্রিতে চুয়ার বাড়িতে পাহারা না থাকতে পারে।"
"অতটা ভরসা করি না। যা হোক, দেখা যাক।"

পর্ব ৭

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জন বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণপল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কর সুত্রধরদের বাস। সেখানে উপস্থিত হইয়া দুই জনে দেখিলেন, রাশি রাশি স্তূপীকৃত শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল কাষ্ঠের প্রাকারের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ নৌকা তৈয়ার হইতেছে। কোনটির কংকালমাত্র গঠিত হইয়াছে, কোনটি পাটাতনে শোভিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া

উঠিতেছে। বড় বড় বজরা—পঞ্চাশ দাঁড়ের নৌকা—কাহারও হাঙ্গর-মুখ, কেহ বা ময়ূরপঙ্খী, কেহ বা হংসমুখী। আবার ক্ষুদ্রকায় ডিঙ্গি, সংকীর্ণ-দেহ ছিপও আছে। কোনটি সম্পূর্ন হইয়াছে, কোনটি এখনও অসম্পূর্ণ।
দুই জনে অনেক নৌকা দেখিয়া শেষে একটি ডিঙ্গি পছন্দ করিলেন। ডিঙ্গির সুন্দর গঠন, আড়াই হাত চওড়া, আট হাত লম্বা—শোলার মত হালকা। মাত্র চারি জন লোক তাহাতে বসিতে পারে।
নিমাই পণ্ডিত ছুতারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"
ছুতার কিন্তু ডিঙ্গি বেচিতে রাজী হইল না, বলিল, "ফরমাশী ডিঙ্গি।"
চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ ডিঙ্গির জন্য কত দাম পাবে?"
ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল, "তিন তঙ্কা।"
চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙ্গির মালিকত্ব চন্দনদাসকে সমর্পন করিল।
ডিঙ্গি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পণ্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহন করিয়া দুই জোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙ্গি জ্যা-মুক্ত তীরের মতো জলের উপর ছুটিয়ে গেল।
কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙ্গি নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তারপর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙ্গি নিয়ে যাব।"
ছুতার সাহ্লাদে এক দিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।
অতঃপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কাজ শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।
যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁধা ছিল; চন্দনদাস কয়েকজন মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তোমরা জেলে তো?"
"আজ্ঞে, কর্তা।"
"তোমাদের মোড়ল কে?"
একজন বৃদ্ধ-গোছের জেলে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।"
"বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন তো?"
"আজ্ঞে।"
"কত জেলে-ডিঙ্গি তোমাদের আছে?"
"তা—ত্রিশ-চল্লিশখানা হবে।"
"বেশ। শোনো; তোমাদের যত জেলে-ডিঙ্গি আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধবে। তারপর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি যদি না যাই, আহলে আবার ফিরে আসবে।—বুঝলে?"
"বুঝলাম কর্তা। কিন্তু কাজটা কি, তা তো এখনও জানতে পারিনি।"
"কাজের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন, রাজী আছ?"
"আজ্ঞে, গররাজী নই। কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই?"
"বলেছি তো, তাহলে ফিরে আসবে।"
"কিন্তু আমাদের যাওয়া-আসা যে তাহলে না-হক হয়রানি হয়, কর্তা। আপনাকে তখন পাব কোথায়? আপনাকে তো চিনি না।"
চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "তা হলেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকো শান্তিপুরে যাওয়া-আসার জন্য কত ভাড়া লাগবে?"

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, দশটি তঙ্কার কমে হবে না।"
চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারি করিল। কারণ, এক কথায় রাজী হইয়া গেলে জেলেরা কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কষা-মাজার পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।"
"আজ্ঞে"—শিবদাস মুদ্রা গণিয়া লইল, "আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন কর্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব—"
"সব ডিঙ্গি নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।"
"আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।"
এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গি তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্তমনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পর্ব ৮

রাত্রি তিন প্রহরে, চুয়ার বাড়ির দালানে পাইক দুই জন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দেয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মতো একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।
চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়। চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মতো দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল তারপর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।
যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। তা ছাড়া দরজার কবাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবন্ধ কি না বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কবাট একটু ঠেলিল। মরিচাধরা হাঁসকলে ছুঁচার ডাকের মতো শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।
হাঁসকলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাসস্পন্দিত-বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।
চন্দনদাস তখন আবার কবাট একটু ঠেলিল, কবাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।
আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে? চাঁপাও বাড়িতে আছে; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া

যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্বনাশ। চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।
চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কানে কাছে মৃদু শব্দ হইল, “এসেছ?”
“চুয়া!” কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে দুয়ার হাত ধরিল, বলিল, “চুয়া! এসেছি।”
চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে বলিল, “তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্য সারা রাত জেগে আছি।”
অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মতো শুনাইত; কিন্তু বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জাগিতে লাগিল। অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কানে কানে বলিল, “চুয়া, একটা আলো জ্বালতে পারো না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।”
দু’জন অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “আচ্ছা, এসো।”—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “চাঁপা কোথায়?”
“ঘুমুচ্ছে।”
“ঠান্‌দি?”
“ঠান্‌দিও ঘুমিয়ে পড়েছে।”
গোহালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল—চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।
চন্দনদাসের বুকে বেদনার শূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “চুয়া!”
চুয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল; রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, “তোমার নৌকো চলে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল!”
চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।”
চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, “কি?”
চন্দনদাস বলিল, “বলছি। আগে বলো দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জানো?”
অবসাদ-ভরা সুরে চুয়া বলিল, “জানি। তাই তো ডুবে মরতে পারিনি। কতবার সে চেষ্টা করেছি।”
চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল, বলিল, “ও কথা ভুলে যাও, চুয়া, বুকে সাহস আলো। আমি এসেছে দেখেও তোমার সাহস হয় না?”
চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখ দুটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; হয়তো নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল; চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিতনয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগল।
চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই,—হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধারকর্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা তখন সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, “একটা কথা বলো।”

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টার করিতে করিতে বলিল, “চুয়া, চুয়া, কি কথা?”
“বলো, আমায় বিয়ে করবে? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না?”
চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, “চুয়া, আমার মায়ের নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে, তবে আমি কুলাঙ্গার।”
চুয়ার মাথা আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, “তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন?”
চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু সুবুদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, “না—এখন ভরসা হয় না। বাড়ির দোরে পাহারা—যদি ওরা জেগে ওঠে।—কিন্তু আমার এখানে আর থাকা বোধ হয় নিরাপদ নয়—চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।”—বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।
চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে; কি জানি কি হয়! সে ভয়-কাতর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, “যাচ্ছ?—কিন্তু—“
“কোনও ভয় নেই, চুয়া।”
“কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিস দিতে পারবে?”
“কি?” একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—“
চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঁঢ়স্বরে বলিল, “চুয়া, যদি দেখ কোনও আশা নেই তবেই ব্যবহার করো, তার আগে নয়।”—বলিয়া কাঁটার ভয়ংকর কার্যকাতিতা বুঝাইয়া দিল।
এতক্ষণে চুয়ার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রোজ্জ্বল চক্ষে বলিল, “আর আমি ভয় করি না।”
চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিল, “চুয়া—“
বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।
চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, “চুয়া নয়—চুয়া বউ। এই আমদের বিয়ে।”
ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল, “ঠান্‌দির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ব’লো—কাল সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে যায়। সেখানে দু’-এক দিন লুকিয়ে থাকবে, তারপর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।”
গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়াছে। পূর্বাকশে শুকতারা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তারপর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে ছায়ামূর্তির মতো বাহির হইয়া গেল।
পাইক দুই জন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

পর্ব ৯

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, আহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয়-বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কাজ শেষ হইয়াছিল; মাধবের অনুমতি পাইয়া সে প্রমোদ-উদ্যানে পূজার আয়োজন করিতে গেল।

সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই-চারি জন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল একজন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল। নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া দিল। পাশে নৌকাঘাট নির্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে-ডিঙ্গি একটিও নাই। দুই-একখানি স্থূলকলেরব মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি স্রোতের মুখে বাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে। ক্রমে ডিঙ্গি মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গাবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিতমুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙ্গির দিকে তাকাইল, তারপর স্পন্দিতবক্ষে একটি গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল। বাদ্যধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা শিঙা-ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ-বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কিধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশী জবামাল্য-পরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল।

তারপর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিমেষেই দৃষ্টি-বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সর্দার, এ তোমাকের কিসের মিছিল?"

বদন সর্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায় দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তারপর রূঢ়স্বরে কহিল, "তোর অত খবরে দরকার কি?"

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "না না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" মনে মনে বলিল, "মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি!"

পরবর্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল; তাহার গলায় লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য—হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।
জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল; তাহার ঠোঁট দুটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথমে এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।
পাইকেরা কিনারায় কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।
এই সময় একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ!"
একজন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সুতা হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঘাটের শানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতাএ দেখিয়া বাকি কয়জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুট—এমন সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা চুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল। পাইকেরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকেরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষে দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, এই অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে। চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।
তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। তারপর "ধর্‌ ধর্‌, পালাল, পালাল—" বলিয়া কয়েকজন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল, কয়েক জন নৌকার সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতে লাগিল।
গঙ্গার বুকে যে ছোট্ট ডিঙ্গি ভাসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগল। চন্দনদাস বলিল, "চুয়া, যদি হাঁপিয়ে পড়ে থাকো, আমার কাঁধ ধরো।"
চুয়া বলিল, "না, আমি পারব।"
চন্দনদাস পিছি ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত পরে দুই জনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কানা ধরিল।
নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল। যে পাইকটা সর্বাগ্রে আসিতেছিল, সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দু'খানা দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।
দুই জনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পাখির মতো উড়িয়া চলিল।
নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙর করা ছিল। অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মতো দেখাইতেছিল।
রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল; মুহূর্তমধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।
নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমার কাজ তো শেষ হল, আমি এবার ফিরি।"
চন্দনদাস হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম করে যান।"
নৌকায় দুইটি কুঠুরি—একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের

মেঝেয় রঙীন পক্ষ্মল সুতির আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এক কোণে জড়সড় হইয়া অর্ধশুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেটারি হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।
নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপি চুপি বলিল, "ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভাল হয়।"
নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের? বাড়ি গিয়ে বিয়ে করো।"
চন্দনদাস ভারি ভালোমানুষের মতো বলিল, "না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে?—তা ছাড়া, নৌকোয় একটি বই শোবার ঘর নেই।"
নিমাই বলিলেন, "কিন্তু বিয়ে দিই কি করে? উপকরণ কই?"
"ঠাকুর, আপনি পণ্ডিতমানুষ, সামান্য পুরুত তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।"
নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরন করে এনেছ, সুতরাং তোমাকের রাক্ষস-বিবাহ হতে পারে। রাক্ষস-বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।"
চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল; বলিল, "চুয়া ঠাকুর এখনই আমাদের বিয়ে দেবেন।"
পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজই বিয়ে করে তবে ছাড়বে।" চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার অমত নাই। বলিলেন, "বেশ। ফুলের মালা তো হবে না, দু'ছড়া হার জোগাড় করো।"
পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দু'গাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।
নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, "দু'জনে দু'জনের গলায় দাও।"
উভয়ে মালা-বদল করিল।
নিমাই বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী করে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।"
উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপূত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি হইল।
তারপর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল, "ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?"
নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, " নিমাই পণ্ডিত যে-বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"
চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে এক মুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, দেবতা, আপনার দক্ষিণা।"
নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, "ঐটি পারব না।—যাক্, আজ উঠিলাম। বুড়িকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগ্‌গির করো। আর, বাড়ি গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ করো। অধিকন্তু ন দোষায়।"
"তা করব। কিন্তু ঠাকুর, আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছ' ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন, আজ রাত্রিটা নৌকোয় কাটিয়ে গেলে হত না?"
"না—আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকায় তো একটি বই ঘর নেই।"—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।
চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।
তারপর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যযামে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গিতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন জোড়হস্তে তদ্গীতচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

(শেষ)

বাঘের বাচ্চা

০১.

পুণা গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু ঊর্ধ্বে গিরিসংকটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চনীচ ছোটবড় পাহাড়ের শ্রেণী—যেন কতকগুলা অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে। তাহারি মধ্যে পিপীলিকার মতো দুইটি প্রাণী সূর্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ক্রমশ দীঘায়মান ছায়া সম্মুখে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

এখান হইতে উপত্যকা দৃষ্টিগোচর নয়, পথেরও কোনও চিহ্ন কোথাও নাই। চতুর্দিকে কেবল উলঙ্গ কর্কশ পাহাড়, মাঝে মাঝে দুই একটা খবাখতি কণ্টকগুল্ম। এই সকল চিহ্ন ছাড়া পথিককে বহুদূরস্থ জনপদে পরিচালিত করিবার কোনও নিদর্শন নাই—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থানে দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অশ্বারোহী দুইজন যে পথ দিয়া নামিতেছিল। তাহাকে পথ বলা চলে না, বিষার জল চুড়া হইতে নামিবার সময় পর্বতগাত্রে যে উপলপিচ্ছিল প্রণালী রচনা করে, এ সেইরূপ একটি প্রণালী, পাহাড়ের শীর্ষ হইতে প্রায় ঋজুরেখায় পদমূল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

সওয়ার দুইজন ঘোড়ার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল, খর্ব্বদেহ রোমশ পাহাড়ী ঘোড়া স্বেচ্ছামত সেই ঢালু বিপজ্জনক পথে সাবধানে অবতরণ করিতেছিল। এই স্থানে পথ এত বেশি ঢালু যে একবার অশ্বের পদস্থলন হইলে আরোহীর মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু সেদিকে আরোহীদের দৃষ্টি নাই।

আরোহীদের মধ্যে একজন প্রাচীন বয়স্ক; মাথার চুল ও গোঁফ পাকা, বর্ণ এত বয়সেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কপালের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শ্বেতচন্দনের দুইটি রেখা বোধ করি জরাজনিত ললাটরেখাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মস্তকে শুভ্র কাপসিবস্ত্রের উষ্ণীষ; দেহে তুলটু আংরাখার ফাঁকে বাম স্কন্ধের উপর উপবীতের একাংশ দেখা যাইতেছে। চোখে-মুখে একটি দৃঢ় আচঞ্চল বুদ্ধির প্রভা। দেখিলেই বুঝা যায় ইনি একজন শাস্ত্রাধ্যায়ী অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণ। ইহার হস্তে কোনও অস্ত্র নাই, কিন্তু যেরূপ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ততার সহিত অবতরণশীল অশ্বপৃষ্ঠে অটল হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে মনে হয় কেব ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়াই ইনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

দ্বিতীয় আরোহীটি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধ করি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই; দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গসদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচঞ্চুর মতো নাসিকা এই অল্প বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মতো একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। চক্ষু দুটি বড় বড়, চক্ষুতারকা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; বালকসুলভ চঞ্চলতা সত্ত্বেও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। ওষ্ঠের উপর ও চিবুকের নিম্নে ঈষান্মাত্র রোমরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাও বর্ণের মলিনতার জন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারিত। সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্য্যলোকে ঝকঝক করিতেছে।

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মতো দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ে শুড়তোলা নাগরা জুতা পর্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ, মৃগাচরণের মতো যেন অতি দ্রুত দৌড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কটি হইতে ঊর্ধ্বে দেহ ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া

বক্ষঃস্থল এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। আরো অদ্ভুত তাহার দুই বাহু; আজানুলম্বিত বলিলেও যথেষ্ট হয় না, সন্দেহ হয় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া হাত বাড়াইলে মাটি হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া লইতে পারে। তাহার উপর যেমন সুপুষ্ট তেমনি পেশীবহুল; দুই বাহু দিয়া কাহাকেও সবলে জড়াইয়া ধরিলে তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বালক হাসিতে হাসিতে চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নামিতেছিল। ঘোড়ার রেকব নাই, লাল রেশমের জরিমোড়া লাগামও ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ কম্বলের জিনের উপর এমনভাবে বসিয়া আছে যেন সে আর ঘোড়া পৃথক নয়— কোন ক্রমেই তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। বাম হস্তে আগাগোড়া লোহার ভারী বল্লমটা এমনি অবহেলাভীরে ধরিয়া আছে যেন পাগড়ির উপর খেলাচ্ছলে রোপিত শুকপুচ্ছটার চেয়েও সেটা হালকা।

ঘোড়া দুইটি পাহাড়ের পদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে, এবার সেইটাতে চড়িতে হইবে। সূর্য পিছনের উচ্চ পাহাড়ের চুড়া স্পর্শ করিল, শীঘ্রই তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িবে।

বালক চতুর্দিকে চাহিয়া যেন প্রাণশক্তির আতিশয্যবশতঃই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, দাদো, প্রতিধ্বনি শুনবে? হোয়া হো হো হো হো! চুপ! এইবার শোনো।

কয়েক মুহুর্ত পরেই তিন দিক হইতে ভৌতিক শব্দ ফিরিয়া আসিল— হোয়া! হো হো হো!

বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তর দিকের একটা উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, ঐটে সবচেয়ে দূরে! আওয়াজ ফিরে আসতে কত দেরি হল দেখলে? চোখে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না কোনটা কাছে, কোনটা দূরে। অন্ধকার রাত্রে পথ হারিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি ভারী কাজে লাগে— না দাদো?

বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, তা লাগে; কিন্তু অন্ধকার রাত্রে এ-রকম জায়গায় পথ হারিয়ে যাবার তোমার কোনও সম্ভাবনা আছে কি?

বালক বলিল, তা নেই। তুমি আমার চোখ বেঁধে দাও, দেখ আমি ঠিক পুণায় ফিরে যেতে পারব।

বৃদ্ধ বলিলেন, সে আমি জানি। লেখাপড়ার দিকে তোমার একেবারে মন নেই, কেবল দিবারাত্রি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পেলেই ভালো থাকো। তোমার বাবা যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন, তখন যে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব তা জানি না।

বালকের মুখে একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, আচ্ছা দাদো, আলিফ ভালো, না অ ভালো? বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা সুবিধে, না ডান দিক থেকে বা দিকে?

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সে তুমি বুঝতে পারবে না। ষোল বছর বয়স হল, এখনো নিজের নাম সই করতে শিখলে না। তোমার লেখাপড়ার চেষ্টা করাই বৃথা!— কিন্তু শিকারের দিকেও তো তোমার মন নেই দেখতে পাই। আজ সারাদিন ঘুরে একটা খরগোসও মারতে পারলে না।

বালক আক্ষেপে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, খরগোস আমি মারতে পারি না, আমার ভারী

মায়া হয়। ঐটুকু জানোয়ার, তার ওপর হিংসার লেশ তার শরীরে নেই— খালি প্রাণপণে পালাতে জানে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কোন জানোয়ার মারতে চাও শুনি—বাঘ!

উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষে কিশোর বলিল, হ্যাঁ, বাঘ। এ পাহাড়ে বাঘ পাওয়া যায় না, দাদো?

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, শুনেছি। আরো দক্ষিণে পাহাড়ের গুহায় বাঘ আছে; কিন্তু তুমি বাঘ মারবে কি করে?

ভয় করবে না?

ভয়! বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। আচ্ছা দাদো, ভয় জিনিসটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই, কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝতে পারি না। ভয় কি ক্ষুধার মতো একটা প্রবৃত্তি?

দাদো বলিলেন, ভয় কি তা বুঝতে পারবে, যেদিন প্রথম যুদ্ধে নামবে, যেদিন হাতিয়ারবন্দ শত্রুকে সামনে দেখতে পাবে।

বালক কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পরীক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দাদো বলিলেন, আমি বড় বড় বীরের মুখে শুনেছি যে তাঁরাও প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পেয়েছেন। এতে লজ্জার বিষয় কিছু নেই; সেই ভয়কে জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব।

সূর্য গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির উপর ছায়ার একটা সূক্ষ্ম, যবনিকা পড়িয়া গেল। শুধু ঊর্ধ্বে নগ্ন গিরিকূট এবং আরো ঊর্ধ্বে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ সিন্দূরবর্ণ ধারণা করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দাদো নিজের অশ্ব সম্মুখে চালিত করিয়া কহিলেন, আর দেরি নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনো দুটো পাহাড় পার হতে বাকি] পুণা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

বালক তাঁহার অনুগামী হইয়া বলিল, তা হলেই বা? আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে ঠিক নিয়ে যাব।

দাদো বলিলেন, রাত্রে এসব পাহাড়-পর্বত নিরাপদ নয়। শোনোনি, এদিকের গাঁয়ে—বস্তিতে আজকাল প্রায় লুঠ-তরাজ হচ্ছে?

বালক ভারী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তাই নাকি? কৈ, আমি তো শুনিনি; কারা লুঠ-তরাজ করছে?

দাদো বলিলেন, তা কেউ জানে না। বোধ হয় এই দিকের বুনো পাহাড়ী মাওলীরা ডাকাতি করছে। বিজাপুর এলাকার তিনটে বড় বড় গ্রাম গত চার মাসের মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে। শুনতে পাই তাদের সদর একজন ছোকরা, লোহার সাজোয়া আর মুখোস পরে ঘোড়ায় চড়ে লুঠেরাগুলোকে ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। ছোঁড়াটা নাকি ভয়ংকর কালো, বেঁটে আর জোয়ান।

বালক তাহার হাতের বল্লমটা খেলাচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাচ্ছিল্যাভরে জিজ্ঞাসা করিল, তই নাকি? তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে, দাদো?

দাদো পাহাড়ে ঘোড়া চড়াইতে চড়াইতে বলিলেন, ও অঞ্চলের দেশমুখরা দরবারে নালিশ করতে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ডাকাতের সদর পুণার লোক।

দাদোর পশ্চাতে বালকও পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা দরবার থেকে কি ব্যবস্থা করলে?

বালক পশ্চাতে থাকিয়া মিটমিটি হাসিতেছিল, দাদো তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না।

পাহাড়ের পিঠের উপর উঠিয়া দুইজনে ক্ষণকাল পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। এখানে আবার সূর্যকিরণ আসিয়া বালকের বল্লমের ফলায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

সম্মুখের পাহাড়তলিতে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল, আচ্ছা দাদো, এখন যদি আমাদের ডাকাতে আক্রমণ করে, তুমি কি করো?

দাদো ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি আর করি। তাদের সঙ্গে লড়াই করি।

তারা যদি পঞ্চাশজন হয়?

তা হলেও লড়ি।

বালক বলিল, কিন্তু সে যে ভারী বোকামি হবে, দাদো। পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়াই করে তুমি পারবে কেন?

দাদো বলিলেন, তাতে কি! না হয় লড়াই করতে করতে মরব।

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু এরকম মরে লাভ কি, দাদো? তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুশমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না বলছিলো, ভয় কাকে বলে জানো না?

বালক বলিল, ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদের জিত হল।

দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছি? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোনোনি?

বালক বলিল, রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যতবড় বীর, তিনি ততবড় বোকা।

দাদো খোঁচা দিয়া বলিলেন, তুমিও তো রাজপুত! মায়ের দিকে থেকে তোমার গায়েও তো যদুবংশের রক্ত আছে।

বালক সবেগে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, না, আমি রাজপুত হতে চাই না, আমি মারাঠী। বালকের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা দাদো, তোমার কাছে তো বড় বড় যুদ্ধের গল্প শুনেছি, কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সম্মুখ-যুদ্ধ করার মানে কি?

দাদো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, সম্মুখ-যুদ্ধ মানে সামনা-সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশি সেই জিতবে।

আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায়?

সে তো আর ধর্মযুদ্ধ হল না।

নাই বা হল! যুদ্ধে হার-জিতই তো আসল— ধর্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি?

দাদো অনেকক্ষণ বালকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, বাপের স্বভাব ষোল আনা পেয়েছে, তেমনি ধূর্ত আর ইশিয়ার— সর্বদাই লাভ-লোকসানের দিকে নজর। আর শুধু বাপ কেন, বংশটাই ধূর্ত! মালোজী ভোঁসলে যদি চালাকি করে যদুবংশের মেয়ে ঘরে না আনতে পারত, তাহলে ভোঁসলে বংশকে চিনত কে? আর শাহুই বা এতবড় জায়গীরদার হাত কোথা থেকে?

পলকের মধ্যে বালকের সংশয়প্রশ্নপূর্ণ মুখভাবের পরিবর্তন হইল। বালকোচিত কৌতুহলে দাদোর নিকটে সরিয়া গিয়া সানুনয়কণ্ঠে বলিল, দাদো, তুমি যে আমার মার বিয়ের গল্প বলবে বলেছিলে, কৈ বললে না? বলো না দাদো, কি করে ঠাকুদা যদুবংশী মেয়ে ঘরে আনলেন।

এই সময় নিমের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষান্ধকার হইতে গাভীর হাম্বারবি ভাসিয়া আসিল। বালক সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ঐ শোনো, দেওরামের গরু ঘরে ফিরে এলো। চলো, চলো দাদো, আর দেরি নয়; সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ভারী ক্ষিদে পেয়ে গেছে— এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করিনি। দেওরামের মেয়ে নুন্নার সঙ্গে সেই যে সকালবেলা তেঁতুলিবনের ধারে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল ফেরবার সময় তাজা দুধ খাওয়াবে। জয় ভবানী!

০২.

বালক দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিতেই ঘোড়া লাফাইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল। আকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য হরিণের মতো পাথর হইতে পাথরের উপর ধাপে ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নীচের দিকে অদৃশ্য হইল।

দাদো বালকের উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, চলে এসো দাদো, দেওরামের ঘর ঝণতিলার টালের উত্তর দিকে কুলগাছের জঙ্গলের মধ্যে; যদি খুঁজে না পাও, হাঁক দিও— নুন্না এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া বন্দরীবনের মধ্যে যখন দেওরামের কুটির অঙ্গনে পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন একটি বারো-তেরো বছরের মাওলী চাষার মেয়ে একটা ক্ষুদ্রকায় গাভীকে দোহনের চেষ্টা করিতেছে এবং বালক ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীটা বোধ হয় অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাই কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দিতেছে না, চেষ্টা করিবামাত্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিল, তুমি ওর শিং দুটো একবার ধরে না, নইলে বজাত গরু কিছুতেই দুইতে দেবে না।

বালক গরুর শিং ধরিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া তামাসা করিয়া বলিল, তুই কেমন মাওলার মেয়ে— গাই দুইতে জনিস না? দাঁড়া, বিশুয়াকে বলে দেব, সে আর তোকে বিয়ে করবে না।

ক্ষুব্ধ লজ্জায় নুন্না এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল, তোমার ঘোড়া দেখেই তো আজ ও অমন করছে, নইলে আমিই তো রোজ দুই।

বালক মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিল, হ্যাঁ, দুই! আর বড়াই করতে হবে না। দে আমায় ঘটি, আমি দুয়ে দিচ্ছি।

নুন্না বলিল, তুমি পারবে না। আমি আর বাবা ছাড়া কেউ ওকে দুইতে পারে না। তোমাকে ও এখনি ফেলে দেবে।

বালকের আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, সে তর্জন করিয়া বলিল, কি! ফেলে দেবে! দেখি তো কেমন তোর গরু? দে ঘটি।

নুন্নার হাত হইতে জোর করিয়া ঘটি কড়িয়া লইয়া বালক দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। গরুটা ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দোহনকারীকে দেখিয়া লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘটি লইয়া মুখে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কি মনে করিয়া গাভীটি দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন বালক সন্তপণে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিয়া গাভীর পশ্চাদিকে বসিয়া দুই জানুর মধ্যে ভাণ্ডটি ধরিয়া যেমন গাভীর উদ্ধসের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অমনি গাভী এক চরণ তুলিয়া তাহাকে এরূপ সবেগে পদাঘাত করিল যে বালক ভাণ্ডসমেত চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

নুন্না কলকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গাভীটা যেন কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদো অশ্ব হইতে অবতরন করিয়া বালকের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লেগেছে নাকি?

বালক অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গরু নয়-ঘোড়া। গরু কখনো আমন চাট ছোঁড়ে? নে নুন্না, তোর ঘটি, আমি ঘোড়ার দুধ খেতে চাই না। বাড়ি চললুম।

বালক আশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে যায় দেখিয়া নুন্না মিনতি করিয়া বলিল, আর একটু দাঁড়াও না, বাবা এলো বলে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে–ঘরে বাজরার রুটি আছে, এনে দেব?

বালক বলিল, না, তোর রুটি-দুধ—কিছু খেতে চাই না। আমি চললুম।

এমন সময় কুটিরের পশ্চাতের ঘন ঝোপের ভিতর হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন খর্বকায় বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়স্ক লোক, অপরটি পাঁচশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের দৃঢ়শারীর যুবা। হাতের বল্লম কুটিরের গায়ে হেলাইয়া রাখিয়া মধ্যবয়সী লোকটি দ্রুতপদে আসিয়া বালকের ঘোড়ার রাশ ধরিল। বালক তখন ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, লোকটি সানুনয় নিম্নকণ্ঠে বলিল, রাজা, ঘোড়া থেকে নামো, দুধ না খেয়ে যেতে পাবে না।

যুবকটিও এতক্ষণে সসন্ত্রম হাস্যোজ্জাসিত মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক একলম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া নুন্নার চুলের মুঠি ধরিল, তাহাকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে যুবকের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রায় তাহার বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নে বিশুয়া, এটাকে তুই ঘরে নিয়ে যা, তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলুম। যদি বজ্জাতি করে, খুব পিটবি। আর ওই হতভাগা গরুটাকেও তুই নিয়ে যা, ওটা হল তোর বিয়ের যৌতুক।

নুন্না বালকের হাত ছাড়াইয়া কুটিরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিশুয়া হাসিতে হাসিতে হেঁট হইয়া বালকের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, তুমি যখন দিলে রাজা, তখন আর আমার ভাবনা কি! এবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে ঘিরে নিয়ে যাব। কি বলো, দেওরাম?

দেওরাম গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল, তা যাস। রাজা যখন তোর হাতে নুন্নাকে দিয়েই দিয়েছে, তখন আর আমি কি বলব? আর, আমি নুন্নার মন জানি, সেও তোকেই বিয়ে করতে b.

এই সময় নুন্নার হাসিমুখ কুটিরের ভিতর হইতে পালকের জন্য দেখা গেল। সে কুটির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দেওরাম ভূপতিত ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ-দোহনে প্রবৃত্ত হইল। গাভীটা এবার আর কোনও আপত্তি করিল না।

বৃদ্ধ দাদো এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাহার মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। এই নির্জন বনের মধ্যে একটিমাত্র কুটির, তাহার অধিবাসী এই ভীমকায় দেওরাম। ইহারা কে এবং বালকের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল কিরূপে?

তিনি অগ্রসর হইয়া বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা একে চিনলে কি করে?

নিমেষের জন্য বিশুয়া ও বালকের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। বিশুয়ার মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, দরবারে ওঁকে দেখেছি, উনি জাগীরদারের ছেলে।

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, তোমরা ওঁকে রাজা বলে ডাকছ কেন?

বিশুয়া কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, দুগ্ধদোহন করিতে করিতে দেওরাম জবাব দিল,

জাগীরদারের ছেলে, উনিই একদিন মালিক হবেন, তাই রাজা বলে ডাকি।

দাদো উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, ইনি জায়গীরদারের মেজো ছেলে তাও জানো না? সে যাক— বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তুমি এদের চিনলে কি করে জিজ্ঞাসা করি?

বালক অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর করিল, শিকার করতে এসে এদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, দাদো। তুমি তো আর প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসো না, তাই জানো না। কতবার শিকার করে ফেরবার মুখে দেওরামের জোয়ারী রুটি খেয়েছি— দেওরাম আমাকে ভারী যত্ন করে।

দাদো বালকের ছলনাহীন মুখের দিকে কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শুধু কহিলেন, আঁর্হ। মনে মনে ভাবিলেন, — তোমার গতিবিধির উপর এখন হইতে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

ধারোষ্ণ দুগ্ধের পাত্র আনিয়া দেওরাম বালকের হাতে দিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি খাবে না?

দাদো কহিলেন, না, তুমি খাও। আমার এখনো আহ্নিক বাকি।

দুগ্ধপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া বালক অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। দেওরামও তাহার অনুবর্তী হইয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইল। এক চুমুক দুগ্ধ পান করিয়া বালক অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, পরশু অমাবস্যা।

দেওরামও অলসভাবে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, হ্যাঁ। লোক সব তৈরি আছে। কোথায় থাকতে হবে?

রাক্ষসমুখো গুহর মধ্যে। আমি দেড় পিাহর রাত্রে আসব। পঁচিশ জনের বেশি লোক যেন না হয়।

বেশ। এবার কোন দিকে যাওয়া হবে?

উত্তর দিকে। দক্ষিণে আর নয়, সেদিকে বড় হৈ চৈ হয়েছে। দরবার পর্যন্ত খবর গেছে। দাদো তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া দেওরাম প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা। হরিণ কিন্তু এদিকে পাওয়া যায় না।

বালক বাকি দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে বলিল, আজ তাহলে চললুম, দেওরাম। নুন্নার বিয়ের দিন আমাকে খবর দিও–আমি দাদোকে নিয়ে আসব। দাদো একজন ভারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জানো তো? উনিই নুন্নার বিয়ে দেবেন।

ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠিয়া বালক বলিল, আর যদি হরিণাছানা পাও, পুণায় নিয়ে যেও। আর দেরি করব না, রাত হয়ে এলো। দাদোর আবার ভারী ডাকাতের ভয়।

বিশুয়া ও দেওরাম দাঁড়াইয়া রহিল, অশ্বারোহী দুইজনে বদরীকানন পার হইয়া ঝরনার সঞ্চিত অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া আবার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। এইটি শেষ পাহাড়ইহার পরই উপত্যক। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, দুইজনেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া দুটি সতর্কভাবে পর্বতগাত্র আরোহণ করিতেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বালক দাদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দাদো তাঁহারই মুখের প্রতি সন্দেহাকুল চক্ষে চাহিয়া আছেন। বালক অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, কি দেখছো, দিগদো? এবার আমার মার বিয়ের গল্প বলে।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিয়াৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আপনার মনে বলিলেন, বংশের ধারা বদলানো যায় না; বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না— ঈশ্বরের এই বিধান। কে জানে, হয়তো এর মধ্যে মঙ্গলেরই বীজ নিহিত আছে।

বালক তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া পুনশ্চ কহিল, বলো না, দাদো?

দাদো আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, গল্প অতি সামান্যই। কিন্তু তোমার ঠাকুদা মালোজী ভোঁসলে যে কি রকম চতুর ছিলেন, এই গল্প থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তোমার মাতুলবংশের মতো এতবড় বিখ্যাত যশস্বী বংশ দক্ষিণাত্যে খুব অল্পই আছে। আজ থেকে নয়, চারশো বছর আগে আলাউদ্দিন খিলজির আমল থেকে দেবগিরির যদুবংশের নাম দক্ষিণাত্যের পাথরে পাথরে তলোয়ার দিয়ে খোদাই হয়ে আসছে।

অতীতের কোন যুগে এই যদুবংশ রাজপুতানা থেকে এসে দেবগিরিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে। দেবগিরির রাজ্যও আর নেই; কিন্তু বীরত্বে, ধর্মনিষ্ঠায়, মহানুভবতায় এই বংশ আজ পর্যন্ত হিন্দুমাত্রেরই আদর্শ হয়ে আছে।

এ-হেন বংশে তোমার দাদামশায় লিখুজী যদুরাও একজন পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দশ হাজার সিপাহী নিত্য তাঁর রুটি খেত। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা তাঁকে যমের মতো ভয় করত, আমেদনগর রাজ্যের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। মালিক অম্বর যদি তাঁর সঙ্গে কপটাচারিতা না করত— কিন্তু সে অন্য কথা। এখন আসল গল্পটা বলি।

সে আজ বহুদিনের ঘটনা, তখন আমার বয়স দশ—এগারো বছরের বেশি নয়; কিন্তু সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল ফাঙ্গুনী পৌর্ণমাসী, রাজপুতদের একটা মস্ত উৎসবের দিন। দাক্ষিণাত্যে দোলপূর্ণিমার দিন আবীর খেলার প্রথা এই যদুবংশই প্রচার করেছিলেন। সেদিন দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক, এমন কি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আমেদনগর দরবারের বড় বড় হিন্দু আমীর-ওমরা এসে লখুজীর কেল্লার মতো বিশাল ইমারতে জমা হতেন। সমস্ত রাত্রিদিনব্যাপী উৎসব চলত, ফাগ, রং এবং সুরার স্রোত বয়ে যেত।

সেবার লখুজীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরবার-ঘরে মজলিস বসেছে। মেঝের ওপর পাসী। গালিচা পাতা, তার ওপর অনেকে বসেছেন; দরবার লোকে লোকরণ্য। সিপাহী থেকে সদাির পর্যন্ত সকলের অবাধ যাতায়াত। সামান্য সৈনিক পাঁচহাজারী সদরের মুখে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে, মনসবদার সিপাহীকে মাটিতে ফেলে তার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। হাসির হররা ছুটছে। ছোট বড়, উচ্চ নীচ কোনও প্রভেদ নেই, এই একদিনের জন্যে সকলে সমান। সবাই আমোদে মত্ত।

সভার মাঝখানে মাস্তবড় একটা চাঁদির থালায় আবীর স্তুপীকৃত রয়েছে, সেই থালা ঘিরে প্রধান প্রধান অতিথিরা বসেছেন। পানদান, গুলাবিপাশ, আতরদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। স্বয়ং লখুজী এখানে আসীন; তোমার ঠাকুদা মালোজীও আছেন। মালোজী তখন লিখুজীর অনুগৃহীত একজন সামান্য সদার মাত্র; কিন্তু তাঁর কূটবুদ্ধি ও রণনৈপুণ্যের জন্যে লিখুজী

তাঁকে ভারী স্নেহ করতেন। তাই মালোজী ও সাহস করে এই সভায় এসে বসেছেন। সকলের মুখেই আবীরের প্রলেপ, দেহের বস্ত্র এবং মিরজাই রঙে রক্তবর্ণ, চক্ষু ঢুলু ঢুলু। এখানে গানের মজলিস বসেছে; আরো অনেক লোক চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে এবং মজা দেখছে।

গান গাইছেন আমেদনগরের একজন বুড়ো ওমরা— তাঁর নাম ভুলে গেছি। মস্ত ওস্তাদ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। গড়গড়া টানতে টানতে হঠাৎ তিনি বসন্তরাগের এক তান মারলেন— সুরের ধমকে পাকা গোঁফ থেকে একরাশ আবীর উড়ে গেল। তোমার ঠাকুদা মালোজী সারঙ্গী কোলে করে ওস্তাদের পিছনে বসে ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংগীত আরম্ভ করলেন। লখুজী নিজে মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

গান থামলে প্রশংসাধ্বনির একটা ঝড় বয়ে গেল, লখুজী পাখোয়াজ ফেলে প্রায় এক তোলা অম্বুরী আন্তর পলিতকেশ গায়কের গোঁফে মাখিয়ে দিয়ে দাঁড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, কৎল কিয়া বিবি! আর একঠো ফর্মাও!

বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে চোখ ঠেরে আবার গান ধরলেন, চোলিমে ছিপাউঁ কৈসে যোবনা মোরি।

বিরাট হাসির একটা হিল্লা পড়ে গেল। লখুজী ওস্তাদকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন। — কি আনন্দের দিনই গিয়েছে; এখন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।

দাদো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘোড়া দুইটি ইতিমধ্যে পর্বত পার হইয়া উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথ এখনো শিলা-সংকুল। আশেপাশে মাটি ফাটিয়া বড় বড় খাদ রচনা করিয়াছে। শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর মতো এই খাদগুলি অন্ধকারে বড়ই বিপজ্জনক, ঘোড়া একবার পা ফস্কাইয়া উহার মধ্যে পড়িলে কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে দিবার দীপ্তিও সম্পূর্ণ নিবিয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখে বহুদূরে পুণার দীপগুলি মিটমিটু করিয়া জ্বলিতেছে।

বালক একাগ্রমনে গল্প শুনিতেছিল, দাদো থামিতেই সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিল, তারপর?

দাদো বলিলেন, হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলো, রাস্তা বড় খারাপ।। তারপর গল্প আরম্ভ করিলেন, দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এই দরবার ঘরের চারিদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, দুজনেরই

বছর, আর মেয়েটির তিন।

এদের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না, এরা নিজের মনে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছিল। কখন এক সময় মেয়েটি দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, গভীর মুখে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আধ-আধি ভাষায় প্রশ্ন করলে, তুমি কে?

ছেলেটিও মেয়েটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললে, আমি শাহু। আমি তীর ছুড়তে পারি। তুমি কে?

মেয়েটির দুই চক্ষু সম্ভ্রমে ভরে উঠল, সে ফুলের মতো ঠোঁট দুটি খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে, আমি দিদা। তারপর একটু ভেবে আবার বললে, আমার বাবাও তীর

অতঃপর এই বীর এবং বীরকন্যার মধ্যে ভাব হতে বেশি দেরি হল না। শাহু গিয়ে মেয়েটির

গলা জড়িয়ে নিলে, মেয়েটিও শাহুর কোমর জড়িয়ে ধরলে। এইভাবে তারা অনেকক্ষণ দরবার-ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে চুপিচুপি কি কথা হল তারাই জানে। খুব সম্ভব শাহু তার অসামান্য শৌর্য-বীর্যের কথা খুব ফলাও করে ব্যাখ্যা করে মেয়েটির ছোট্ট প্রাণটুকু জয় করে নিচ্ছিল। আর মেয়েটিও বোধ হয় নিঃসংশয় সহানুভূতি এবং প্রশং দ্বারা শাহুর বীর-হৃদয় সম্পূর্ণ বশীভুত করে ফেলছিল।

এদিকে গানের মজলিস তখন ঢিলে হয়ে এসেছে; বৃদ্ধ গায়ক তিন পাত্র গুলাবি সরবত খেয়ে কিংখাপের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছেন, — এমন সময় এই দুটি ছেলে-মেয়ে গলা-জড়োজড়ি করে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এতগুলো লোক চারপাশে বসে আছে, কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজেদের কথাতেই তারা মশগুল। বৈঠকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি একসঙ্গে তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। এ কি অপূর্ব আবিভিাব! আজি দোলের দিনে সত্যিই কি বৃন্দাবন-লীলা তাঁদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে? সকলে চোখ মুছে দেখলেন– তাই তো! ছেলেটির বর্ণ নবজলধরশ্যাম, আর মেয়েটি বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী!

মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে আতরদানে তার ছোট্ট চাঁপার কলির মতো আঙুল ডুবিয়ে শাহুর নাকের নীচে আঙুলটি বুলিয়ে দিলে। শাহুও আদর-আপ্যায়নে কম যাবার পাত্র নয়, সে চাঁদির থালা থেকে এক মুঠি আবীর তুলে নিয়ে সযত্নে মেয়েটির মুখে কপালে মাখিয়ে দিলে।

সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, রাধা-গোবিন্দজী কি জয়!

লখুজী আর মালোজী ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এ ছেলে-মেয়ে দুটি কে। লখুজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন, তারপর দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন, রাধা-গোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দুটির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন তো?

লখুজী পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন, তা ছাড়া গুলাবি সরবতের নেশাও অল্পবিস্তর ছিল। তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন, কিন্তু মালোজী ভোঁসলে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে করজোড়ে সকলকে বললেন, মহাশয়গণ, আপনার সাক্ষী থাকুন, লিখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগদত্তা করলেন।

সকলে অবাক হয়ে রইলেন, লখুজীর নেশা ছুটে গেল। তাঁর মুখ আবীর-প্রলেপের ভিতর থেকে ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর মেয়েকে—দেবগিরির রাজবংশের মেয়েকে যে মালোজীর মতো একজন সামান্য প্রাণী নিজের পুত্রবধু করবার স্পধর্ণ করতে পারে, এ তাঁর কল্পনারও অতীত; কিন্তু তবু কথাটা যে তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে গেছে। এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। মালোজীর দিকে কট্রমটু করে চেয়ে লিখুজী বললেন, মালোজী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছি। আমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়বে।

মালোজী পূর্ব্ববৎ জোড়করে বললেন, আমার ছেলে আপনার মেয়ের মুখে আবীর দিয়েছে, আপনার মেয়ে আমার ছেলের মুখে আতর দিয়েছে, তারপর আপনি তাদের কোলে নিয়ে যা বলেছেন তা উপস্থিত সকলেই শুনেছেন। ধর্মতঃ, আপনার মেয়ে আমার ছেলের বাগদত্তা। এখন যদি আপনি সে কথা প্রত্যাহার করতে চান, করুন, আমার আপত্তি নেই।

ক্রোধে লিখুজী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু তাঁদের মনোভাব বুঝতেও বিলম্ব হল না; সকলেই নীরবে মালোজীর কথার সমর্থন করছেন। লখুজী নিজের মেয়েকে কোলে তুলে

নিয়ে ঝড়ের মতো অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

মালোজীও ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে লখুজীর মেয়ে প্রকাশ্য দরবারে মালোজীর ছেলের বাগদত্তা হয়েছে। কথাটা অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকত না, প্রকাশ হয়ে পড়তই; কিন্তু এমনি তোমার ঠাকুন্দর উদ্যম আর তৎপরতা যে সপ্তাহ মধ্যে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র এই সুসংবাদ প্রচার হয়ে পড়ল, জনপ্রাণীরও জানতে বাকি রইল না।

লখুজী নিস্বফল ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। মালোজীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেল, এমন কি মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, মালোজীর মতো ধড়িবাজ অকৃতজ্ঞ লোককে আর তিনি কোনও সাহায্য করবেন না, বরং তার যাতে অনিষ্ট হয়। সেই চেষ্টাই

তাঁর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রইল না। যতই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, ততই তিনি বুঝতে পারলেন চতুর মালোজী তাঁকে কি বিষম ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বুঝলেন অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না, যত তার বয়স বাড়ছে শাহু ছাড়া আর কেউ যে তার স্বামী হতে পারে না, এ ধারণা তার মনে ততই দৃঢ় হচ্ছে। তাছাড়া অন্যের বাগদত্তা মেয়ে কেউ জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় না, দু-চারটে ঘরানা ঘরে সম্বন্ধ করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে লিখুজীকে ফিরে আসতে হল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন শাহু ছাড়া জিজার গতি নেই।

এইভাবে ন-দশ বছর কেটে গেছে। মালোজী কপালের জোরে এবং বুদ্ধিবলে খুব উন্নতি করেছেন, বিষয়-সম্পত্তিও হয়েছে। লখুজীর বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা ক্রমেই কমে আসতে লাগিল। তারপর একদিন মালোজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভাই, আমারই ভুল; জিন্জাকে তুমি তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে যাও।

ব্যাস, আর কি! এইখানেই গল্প শেষ। মালোজীর মতলব সিদ্ধ হল, মহা ধুমধাম করে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়ে গেল। তখন তোমার মার বয়স তেরো বৎসর, আর শাহুর পনেরো। বিয়ের রাত্রে তোমার মার গবোজ্জ্বল হাসি ভরা মুখ আমার আজও মনে আছে।

তবে একথা ঠিক যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ না হলে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, এতবড় সামাজিক পার্থক্য লঙঘন করে এ বিয়ে কখনই হতে পারত না। তোমার মা-বাবা পূর্ব্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।

বৃদ্ধ দাদো মৌন হইলেন। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, দুইজনে নীরবে চলিলেন। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে, পাশের লোকও স্পষ্ট দেখা যায় না। দাদো লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বালক দুই কর যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারংবার কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছে। দান্দো কথা কহিলেন না, অপূর্ব আবেগভরে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বালক বলিল, কি সুন্দর গল্প! আমার মার মতো এমন মা পৃথিবীর আর কারো নেই—না দাদো?

দাদো সংযতকণ্ঠে বলিলেন, না। তোমার মায়ের মতো এমন অসামান্য নারী আর কোথাও নেই। সেই তিন বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি, এমনটি আর দেখিনি।

পূর্ণ হৃদয় লইয়া দুইজনে নীরব রহিলেন। ক্রমে পুণার আলোক নিকটবতী হইতে লাগিল, পুত্র সমতল ও অনুস্থত হইল। অস্বয় আশু গৃহে পৌঁছবার আশয় দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করিল।

পুণা পৌঁছিতে যখন পাদক্রোশ মাত্র বাকি আছে, তখন কে একজন সম্মুখের অন্ধকার হইতে উচ্চকণ্ঠে হাকিল, হে শিব্বা হো! হে দাদোজী!

বালক শিব্বা চমকিয়া উঠিয়া সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, তানা! তানা! তারপর তীরবেগে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অন্ধকারে তানাজী মালেশ্বর ঘোড়ার উপর বসিয়া ছিল, শিব্বা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল।

তানাজি তিরস্কারের সুরে বলিল, আজ কি আর বাড়ি ফিরতে হাওবে না? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মা কত ভাবছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে আমাকে পাঠালেন?

শিব্বা ঘোড়ার উপর হইতেই তানাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা কোথায় রে, তানা?

তানাজি বলিল, কোথায় আবার—বাড়িতে! দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। তোমার এত দেরি হল কেন? গলা খাটো করিয়া বলিল, দেওরামের সঙ্গে দেখা হল নাকি? ওদিকের কি খবর? কবে?

শিব্বা অন্যমনস্কভাবে বলিল, খবর ভালো। অমাবস্যর রাত্রে সব ঠিক হয়েছে — চল তানা, শীগগির বাড়ি যাই। মাকে সমস্ত দিন দেখিনি— ভারী মন-কেমন করছে।

দুই কিশোর বন্ধু তখন নীড়-প্রতিগামী পাখির মতো দ্রুতবেগে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধ দাদোদী কোণ্ডু বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

শেষ

১.

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি-কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্তমাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিতকালের বাস্তব মূর্তিটি তৈয়ারি করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কতদূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ কিছুতেই শেষ হয় না।

আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মতো। যদি বা বহু ক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত তেরিয়া হইয়া এমন মারামারি কাটাকাটি শুরু করিয়া দেন যে, রথি-মহারার্থী ভিন্ন অন্য লোকের সে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। এবং যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই। রণাঙ্গনে ইতস্তত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

তাই, যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়ে তখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার। যে মৃৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মৃৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনাধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উদ্ধেবখিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা বোধ করি। অবহেলা করিয়া এই তুচ্ছ প্রদীপটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মিউজিয়ামে স্থান দেন নাই। আমি সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর আমার নির্জন ঘরে মধুমিশ্রিত গব্য ঘৃত দিয়া উহা জ্বলিলাম। কতদিন পরে এ প্রদীপ আবার জ্বলিল? পুরাবৃত্তের কোন মসীলিপ্ত অধ্যায়কে আলোকিত করিল? বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কোথা হইতে জানিবেন? উহার অঙ্গে তো তাম্রশাসন-শিলালিপি লটকানো নাই! সে কেবল আমার. —এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা দিয়া মুদ্রিত হইয়া আছে।

প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষমধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুত্তলিগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা—কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা—এই বর্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতি ভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল। সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহারই আলোতে আজ এই কাহিনী লিখিতেছি।

আজ হইতে ষোল শতাব্দী আগেকার কথা।

ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজবংশে বিবাহ করিয়া শ্যালককুলের বাহুবলে পাটলিপুত্র দখল করিয়া রাজা হইলেন। রাজা হইলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। পট্টমহাদেবী লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রানী স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একবার নিজ আজ্ঞা প্রচার করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কেহ মানে না। চন্দ্রগুপ্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। নিস্ফল ক্রোধে শক্তিশালী শ্যালককুলের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মৃগয়া, সুরা ও দ্যুতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। রাজা বা রানী যিনিই রাজত্ব করুন, তাহাদের কিছু আসে যায় না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের হাঙ্গামা না থাকিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কাম্বংশ লুপ্ত হইবার পর বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তর্বিবাদে দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিষ্ণুচক্রে চিন্ন সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজারা ক্ষুদ্র কারণে পরস্পর কলহ করিয়া প্রজার দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কিছু শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পাইয়া প্রজারা তৃপ্ত ছিল, রাজা বা রানী—কে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তাহা দেখিবার তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, তরুণী পট্টমহিষী একমাত্র শিশুপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে লইয়া রাজ-অবরোধ হইতে প্রজা শাসন করিতেছেন, দেশে নিরুপদ্রব শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন শরৎকালের নির্মল প্রভাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরোপকণ্ঠের বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গেলেন। মহারাজ মৃগয়ায় যাইবেন, সুতরাং পূর্ব হইতে বনমধ্যে বস্ত্রাবাস ছাউনি পড়িল। কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণের পট্টাবাসা সকল অকালপ্রফুল্ল কিংশুকগুচ্ছের ন্যায় বনস্থলী আলোকিত করিল। কিঙ্করী, নর্তকী, তাম্বলিক, সংবাহক, সূপকার, নহাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসী কর্ম-কোলাহলে ও আনন্দ কলরবে কাননলক্ষ্মীর বিশ্রাব্ধ শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর যথাসময়ে পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরারুণনেত্র মগধেশ্বর মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে দূতক্রীড়া ও তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত আনন্দে কালাহরণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে পানভোজনের পর অন্য সকলকে শিবিরে রাখিয়া মাত্র চারিজন বয়স্য সঙ্গে মহারাজ অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যরা সকলেই মহারাজের সমবয়স্ক যুবা, সকলেই সমান লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। চাটুমিশ্রিত ব্যঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা মহারাজের সঙ্গে চলিল।

মৃগা-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহরে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কুলে সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। সর্বাগ্রে মহারাজ দেখিলেন, তটিনীর উচ্চ তাঁটের উপর ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মতো এক নারীমূর্তি পড়িয়া আছে। দেহে বস্ত্র কিংবা আভরণ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন। কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, কর্ণে অল্প রক্ত চিহ্ন। দেখিলে বুঝা যায়, দসুযুতে ইহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে।

রাজা ত্বরিতপদে অশ্ব হইতে নামিয়া রমণীমূর্তির নিকটে গেলেন। নির্নিমেন্য নেত্রে তাহার নগ্ন দেহ-লাবণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারীর বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশের অধিক হইবে না। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ; রাজা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া সন্তর্পণে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—প্রাণ আছে, দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

বয়স্য চারিজন ইতিমধ্যে রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও লুব্ধদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীনার অনাবৃত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা রাজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “এ নারী কাহার?”

রাজার আরক্ত মুখমণ্ডল ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বয়স্যগণ পরিহাস করিতে সাহসী হইল না। একজন কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলিল, “রাজ্যের সকল নর-নারীই মহারাজের।”

মহারাজ বোধ করি অন্য কিছু ভাবিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইয়া তিনি প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিলেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “এ নারী কাহার?”

মন বুঝিয়া বয়স্য বলিল, “মহারাজের।”

তৃতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বয়স্য—সে অন্তরের দুর্দম লালসা গোপন করিতে পারিল না—ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “দসু-উপদ্রুতা নারী শ্রীমৎ মগধেশ্বরের ভোগ্য নয়। এই নারীদেহটা মহারাজ অধমকে দান করুন।”

বারুণী-কষায়িত নেত্রী কিছুক্ষণ তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “বিট, স্বর্গের পারিজাত লইয়া তুই কি করিবি? এ নারী আমার!”-এই বলিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রজালে রমণীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

লুব্ধ বয়স্য তখনও আশা ছাড়ে নাই—রূপসীর প্রতি সতৃষ্ণ একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, “কিন্তু মহারাজ, এ অনুচিত। পট্টমহাদেবী শুনিলে...”

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, “পট্টমহাদেবী? রে পীঠমর্দ, পট্টমহাদেবী আমার ভর্ত্রী নয়, আমি তার ভর্তর্চ—বুঝিলি? এ রাজ্য আমার, এ নারী আমার-পট্টমহাদেবীর নয়।”

এই আকস্মিক উগ্র ক্রোধে বয়স্যগণ ভয়ে নিশ্চল বাকশূন্য হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিলেন, “এই নারীকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করিলম। বয়স্যগণ, মহাদেবীকে প্রণাম কর।”

যন্ত্রচালিতবৎ বয়স্যগণ প্রণাম করিল।

তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তপণে বক্ষে তুলিয়া মহারাজ অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।

শিবিরে ফিরিয়া সংজ্ঞালাভ করিবার পর রমণী যে পরিচয় দিল তাহা এইরূপ—

তাহার নাম সোমদত্তা। সে শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, পিতার সহিত চম্পাদেশে যাইতেছিল,

পথে আটবিক দস্য কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহার পিতাকে দাসুয়ূরা মারিয়া ফেলে। অতঃপর দস্যপতি তাহার রূপযৌবন দেখিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করে। অন্য দসুযাগণ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল। ফলে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ করিল। এবং একে অন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া, যাহাকে লইয়া কলহ। তাহাকেই অরক্ষিত ফেলিয়া গেল। যাইবার সময় একজন চতুর দাসু, পাছে সোমদত্তা কোথাও পলায়ন করে, এই ভয়ে তাহার বস্ত্র কড়িয়া লইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যায়।

যথাকালে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে দোলায় তুলিয়া নগরে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রমত বিবাহ হইল কি না জানা গেল না, যদি বা হইয়া থাকে তাহা গান্ধর্ব কিংবা পৈশাচ-জাতীয়। যাহা হউক, দাসীসহচরীপরিবৃত সোমদত্তা রাজপুরীর পুরস্ত্রী হইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার অবস্থানের জন্য মহারাজ একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দেশ করিয়া দিলেন।

কুমারদেবী রাজার এই দুষ্মন্ত-উপাখ্যান শুনিলেন, কিন্তু ঘৃণাভরে কোনও কথা বলিলেন না। বিশেষত, সেকালের রাজাদের পক্ষে ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য ছিল না। একাধিক পত্নী ও উপপত্নী সকল রাজ-অন্তঃপুরেই স্থান পাইত। এমন কি, প্রকাশ্য বেশ্যাকে বিবাহ করাও রাজন্যসমাজে অপ্রচলিত ছিল না। কুমারদেবী অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মতো সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

তারপর একদিন চুত-মধুক-সুগন্ধি বসন্তকালের প্রারম্ভে জলস্থল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপালের মতো এক বিরাট বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র আছে। পুষ্করণা নামক মরুরাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্মা দিগ্বিজয় যাত্রার পথে মগধ আক্রমণ করিলেন। হীনবীর্য মগধ বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল। কিন্তু চন্দ্রবর্মা যাহা সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইল না,—তিনি পাটলিপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশাল সেনা-সমুদ্রের মধ্যস্থলে পাটলিপুত্র দুর্গ দশ লৌহদ্বারে ইন্দ্রকীলক আটিয়া দিয়া ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মতো জাগিয়া রহিল।

মগধেশ্বর তখন সোমদত্তার গজদন্ত পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; প্রহরিণীর মুখে এই বাতা শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বহুকাললুপ্ত ক্ষত্রিতেজ নিমেষের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার বর্ম?"—বলিয়াই তাঁহার কুমারদেবীর কথা স্মরণ হইল, মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। ক্ষীণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আক্রমণ করিয়াছে তা আমি কি করিব। পট্টমহাদেবীর কাছে যাও।"—বলিয়া পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সোমদত্তা প্রাসাদ চুড়া হইতে দ্রুত চঞ্চলপদে নামিয়া আসিয়া দেখিল, রাজা পূর্ববৎ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। তাহার শিখরতুল্য দশনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি হাসিয়া গেল। রাজার মস্তকে মৃদু করস্পর্শ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ঘুমাও বীরশ্রেষ্ঠ! ঘুমাও!"

এদিকে প্রহরিণী পট্টমহাদেবীকে গিয়া সংবাদ দিল। কুমারদেবী তখন ষষ্ঠবর্ষীয় কুমার সমুদ্রগুপ্তকে শিক্ষা দিতেছিলেন : "পুত্র, তুমি লিচ্ছবিকুলের দৌহিত্র, এ কথা কখনও ভুলিও না। পাটলিপুত্র তোমার পাদপীঠ মাত্র। ভরতের মতো, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মতো, চণ্ডাশোকের মতো এই সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা তোমার সাম্রাজ্য,–এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি বাহুবলে গুর্জর হইতে সমতট, হিমাদ্রি হইতে অনার্য পাণ্ড্য-দেশ পর্যন্ত পদানত করিবে। তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে, আযাবর্তে ও দক্ষিণাত্যে সমান অপ্রতিহত হইবে।"

বালক রত্নখচিত ক্রীড়াকান্দুক হস্তে লইয়া গম্ভীরমুখে মাতার কথা শুনিতেছিল।

এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে ভয়ংকর সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, আর্যপুত্র কোথায়। কিন্তু সে ইচ্ছা নিরোধ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র কঞ্চুকীকে মহামাত্যের কাছে পাঠাও—এখনি তাঁহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক। দুর্গের দ্বার সকল রুদ্ধ হউক। বিনা যুদ্ধে মহাস্থানীয় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিব না।"

মহাদেবীর আদেশের প্রয়োজন ছিল না, মহাসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক পূর্বেই দুর্গদ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল, সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহজালিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্নায়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুকিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিখা-পারস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদূষিত শর নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রাকারের হস্তিনখমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রুসৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে তপ্ত-তৈল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগোদ্যমে ফিরিয়া যাইতেছিল।

পূর্ণ একদিন এইভাবে যুদ্ধ হইল। চন্দ্রবমর্ণ রণহস্তীর দ্বারা দুর্গদ্বারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। সর্বাঙ্গ বাণিবিদ্ধ হস্তী মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। চন্দ্রবর্মা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া দুর্গজয় সহজ নহে।

তখন তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন ব্যাপ্ত করিয়া তাহদের শিবির পড়িল। নদীতে কাতারে কাতারে তরণী আসিয়া দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে গণ্ডি রচনা করিল। পাটলিপুত্রে পিপীলিকারও আগম-নিগমের পথ রহিল। rt

ভিতরে মহামাত্য কুমারদেবীকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "আশু ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু বর্বর চন্দ্রবর্মা আমাদের অন্যহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখা যাক, কতদূর কি হয়।"

দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্মার উদ্দেশ্য কিন্তু দুই প্রকার ছিল। ক্ষুদ্র দুর্বল পাটলিপুত্র অচিরাৎ দখল করিতে তিনি বড় ব্যগ্র ছিলেন না। হইলে ভালো, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; আপাতত মগধের অন্যত্র জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু তাঁহার স্থল-সৈন্য বহুদূর পথ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত—তাহাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার দেশে নিরুপদ্রবে। ক্লান্তিবিনোদনের জন্য বসিলেন। গঙ্গার স্রোতে তাঁহার নৌবহর নোঙ্গর ফেলিল। দুগবিরোধ ও শ্রান্তি অপনোদন একসঙ্গে চলিল।

দুর্গ অবরোধের পঞ্চম দিবসে মহামাত্য আসিয়া রানীকে জানাইলেন যে, দুর্গের খাদ্যভার কমিতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার কিছু বিধি-ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্ত্রীর সহিত কুমারদেবী বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনে খাদ্য আনিবার কোনও পথ কি নাই?"

সচিব বলিলেন, "হয়তো আছে, কিন্তু আমরা জানি না। নদীপথে খাদ্য আনা যাইতে পারিত,

কিন্তু সে পথও বন্ধ। দুবৃত্ত চন্দ্রবর্মা নৌকা দিয়া বৃহ সাজাইয়া রাখিয়াছে।"

"তবে এখন উপায়?"

"একমাত্র উপায় আছে।"

তারপর আরও অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল।

শেষে মহামাত্য বিদায় লইলে পর কুমারদেবী অলক্ষিতে প্রাসোদশীর্ষে উঠিলেন। অঞ্চলের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ দূত-পারাবিত বাহির করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। পারাবত দুইবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল।। যতক্ষণ দেখা যায়, কুমারদেবী আকাশের সেই কৃষ্ণবিন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর আরও আট দিন কাটিল। চন্দ্রবর্মা কোনও প্রকার যুদ্ধোদ্যম না করিয়া কেবলমাত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য দুমূল্য হইতে আরম্ভ করিল। নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল।

এইরূপে আশায় আশঙ্কায় আরও একপক্ষ অতীত হইল। ফাল্গুন নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই বিট—সেই পীঠমর্দ, যে সোমদত্তার অনাবৃত যৌবনশ্রী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে আমি। তখন আমার নাম ছিল, চক্রায়ুধ ঈশানবমর্ণ। ঘটোৎকচগুপ্তের ন্যায় আমার পিতাও একজন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়া রাজধানীতে রাজার সাহচর্যে নাগরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্যে বিলাসে কালব্যাপন করিতেছিলাম।

তীব্র আসবপান করিলে যে বিচারহীন বিবেকহীন মত্ততা জন্মে, সোমদত্তাকে দেখিয়া আমার সেই মত্ততা জন্মিয়াছিল। অবশ্য, বিবেকবুদ্ধি তৎপূর্বেই যে আমার অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা নহে। চিরদিন আমার চিত্ত বল্গীশূন্য অশ্বের মতো শাসনে অনভ্যস্ত। কোনও বস্তু আত্মসাৎ করিতে—তা সে নারীই হউক বা ধনরত্নই হউক—নিজের ঐহিক সুবিধা ও সামর্থ্য ভিন্ন কোনও নিষেধ কখনও স্বীকার করি নাই। গুরুলঘুজ্ঞান কদাপি আমার বাসনার সামগ্রীকে দুপ্রাপ্য করিয়া তুলে নাই। যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছি, ছলে-বলে যেমন করিয়া পারি তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দ্রগুপ্ত যখন সোমদত্তাকে শ্যেনপক্ষীর মতো আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তখন বাধাপ্রাপ্ত প্রতিহত বাসনা দুবার আক্রোশে আমার বক্ষের মধ্যে গর্জন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা, আমি তাহার নামসহচর—বয়স্য; কিন্তু তথাপি কোনও দিন তাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতার ভাবিতে পারি নাই। শ্যালকপ্রসাদে সে রাজা হইয়াছে; সুযোগ ঘটিলে আমিও কি হইতে পারিতাম না? বাহুবলে, রণশিক্ষায়, নীতিকৌশলে, বংশগরিমায় আমি তাহার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নাহি। তবে কোন অধিকারে সে আমার ঈপ্সিত বস্তু কাড়িয়া লাইল?

অন্য তিন জন রাজপ্রসাদলোভী চাটুকার, যাহারা সেদিন আমার নিগ্রহ দেখিয়াছিল, তাহারা আমার ক্রোধ ও অন্তর্দাহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তামাশা-বিদ্রুপ-ইঙ্গিতের গোপন দংশনে আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। একদিন, চন্দ্রগুপ্ত তখনও সভায় আগমন করেন নাই, সভাস্থ পারিষদবর্গের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপি হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধাপাল আমাকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "চক্রায়ুধ, দেখ তো এই রত্নটি

কেমন, কৌশলের কোনও শ্রেষ্ঠী মহারাজকে উপহার দিয়াছে। মহারাজ বলিয়াছেন, রত্নটি যদি অনাবিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বয়ং রাখিবেন, নচেৎ তোমাকে উহা দান করিবেন। দেখ তো, রত্নটি বজ্রসমূৎকীর্ণ কি না।"—বলিয়া একটি ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্টজাতীয় মণি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সভার দৃঢ় ব্যক্তিগণ এই কদর্য ইঙ্গিতে কেহ দাঁত বাহির করিয়া, কেহ বা নিঃশব্দে হাসিল। সিংহাসনের পার্শ্বে চামরবাহিনী কিঙ্করীগণ মুখে অঞ্চল দিয়া পরস্পরের প্রতি সকৌতুকে কটাক্ষ হানিল। আমি লজায় মরিয়া গেলাম।

ক্রমে আমার কথা পাটলিপুত্র নগরের কাহারও অবিদিত রহিল না। আমি কোনও গোষ্ঠীসমবায় বা সমাপানকে পদাপণ করিবামাত্র চোখে চোখে কটাক্ষে কটাক্ষে গুপ্ত ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া যাইত। রাজসভায় রাজা আমাকে দেখিয়া ভ্রুকুটি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাকে রাজসভা ছাড়িতে হইল, লোক-সমাজও দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিজ হর্ম্যতলে একাকী বসিয়া অন্তরের অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

এই সময় সমুদ্রোচ্ছাসতুল্য অভিযান পাটলিপুত্রের দুর্গাঁতটো আসিয়া প্রহত হইল। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়িল। মহাবলাধিকৃত বিরোধব্যমা আমাকে শতরক্ষীর অধিনায়ক করিয়া গৌতম-দ্বার নামক দুর্গের পশ্চিম তোরণ রক্ষার ভার দিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। আমি অভ্যাসমত প্রাকারের উপর একাকী পদচারণ করিতেছিলাম। অবসন্ন বসন্তের শেষ চম্পা চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করিতেছিল।

বাহিরে শত্রুশিবিরে দীপসকল প্রায় নিবিয়া গিয়াছে—দূরে দূরে দুই একটা জ্বলিতেছে। নিম্নে পরিখার জল স্থির কৃষ্ণদর্পণের মতো পড়িয়া আছে, তাহাতে আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পডিয়াছে। নগরের মধ্যে শব্দ নাই, আলোক নাই, গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, দীপ নিবপিত। রাজপথেও আলোকইন, তামসী রাত্রির গহন অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়া চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পাটলিপুত্র সুপ্ত, অরাতি-সৈন্যও সুপ্ত। কিন্তু নগরদ্বারের প্রহরীরা জাগ্রত। তোরণের উপর নিঃশব্দে রাষ্ট্রীগণ প্রহরা দিতেছে। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে সতর্ক রক্ষী নিশ্চলভাবে লণ্ডায়মান। শত্রু পাছে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতর্কিতে প্রাকার-লঙঘনের চেষ্টা করে, এইজন্য রাত্রিতে পাহারা দ্বিগুণ সাবধান থাকে।

রাজপুরী হইতে বেহাগ-রাগিণীতে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের দশ দ্বারের প্রহরী দুন্দুভি বাজাইয়া উচ্চ-কণ্ঠে প্রহর হকিল। নৈশ নীরবতা ক্ষণকালের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া এই উচ্চ রোল ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল; নগরী যেন শত্রুকে জানাইয়া দিল—"সাবধান! আমি জাগিয়া আছি!"

একাকী পদচারণ করিতে করিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল। কিসের জন্য এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিশাচরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? পাটলিপুত্র দুর্গ রক্ষা করিয়া আমার লাভ কি? যাহার রাজ্য, সে তো কামিনীর কণ্ঠালগ্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাটলিপুত্র যদি চন্দ্রবর্মা অধিকার করে, তবে কাহার কি ক্ষতি? দুর্গের মধ্যে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিয়াছে, মানুষ না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য আনয়নের উপায় নাই। শুধু রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জালিকেরা নদী হইতে প্রত্যহ কিছু

কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাঁহাই বা কতটুকু?—নগরীর ক্ষুধা তাহাতে মিটে না। এভাবে আর কত দিন চলিবে? অবশেষে একদিন বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে; তবে অনর্থক এ ক্লেশ ভোগ কেন? সমগ্র দেশ যখন চন্দ্রবর্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তখন পাটলিপুত্র নগর একা কয়দিন টিকিয়া থাকিবে?

চন্দ্রগুপ্ত যদি রাজ্যাধিকারের যোগ্য হইত, তবে সে নিজে আসিয়া নিজের রাজ্য রক্ষা করিত। আমি কেন এই অপদার্থ রাজার রাজ্যেরক্ষায় সাহায্য করিতেছি? সে আমার কি করিয়াছে? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। সোমদত্তা! সেই দেবভোগ্য অপ্সরা! বুঝি পুরুষের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্যই তাহার অনুপম দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাকে না পাইলে আমার এই অনির্বাণ তৃষ্ণা মিটিবে কি?—সে এখন চন্দ্রগুপ্তের অঙ্কশায়িনী। চন্দ্রগুপ্ত কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? কারুক না করুক, সোমদত্তাকে আমার চাই; যেমন করিয়া পারি, যে উপায়ে পারি, সোমদত্তাকে আমি কাড়িয়া লইব। পারিব না? নারীর মন কত দিন এক পুরুযে আসক্ত থাকিবে? তখন চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিব। সেই আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ হইবে।

এই সর্বগ্রাসী চিন্তা মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে গোতম-দ্বার হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাকারের এই অংশ রাত্রিকালে স্বভাবতই অতিশয় নির্জন। এই স্থানের দুর্গ-প্রাচীর এতই দুরধিগম্য যে, প্রহরী-স্থাপনেরও প্রয়োজন হয় নাই।

ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা চোখে পড়িল, সম্মুখে কিছুদূরে প্রাকারের প্রান্তস্থিত এক কণ্টকগুলোর অন্তরালে দীপ জ্বলিতেছে। পাছে বাহির হইতে শত্রু দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করে, এজন্য প্রাচীরগাত্রে সর্বত্র কাঁটাগাছ রোপিত থাকিত। কখনও কখনও এই সকল কাঁটাগাছ প্রাকারশীর্ষ ছাড়াইয়া মাথা তুলিত। সেইরূপ দুইটি ঘন-পল্লবিত কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিলাম। প্রদীপ। কখনও উঠিতেছে, কখনও মণ্ডলাকারে আবর্তিত হইতেছে। কেহ যেন একান্তে দাঁড়াইয়া কোনও অদৃশ্য দেবতার আরতি করিতেছে।

পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হস্তে লইলাম। তারপর অতি সন্তপণে সেই সঞ্চরমাণ দীপশিখার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কণ্টকগুলোব মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে এক নারী দাঁড়াইয়া পরিখার অপর পারে অনন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; এবং প্রদীপ ইতস্তত আন্দোলিত করিতেছে; পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলাম না, শুধু চোখে পড়িল, তাহার নবমল্লিকাবেষ্টিত কুণ্ডলিত কবরীভার, তন্মধ্যে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্পচক্ষুর মতো জ্বলিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ রমণী গুপ্তচর; আলোকের ইঙ্গিতে শত্রুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।

লঘুহস্তে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলম। সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিদ্যুদ্বেগে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারই হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোকে তাহাকে চিনিলাম।

সোমদত্তা!

কম্পিত দীপশিখার আলোক তাহার ত্রাসবিবৃত মুখের উপর পড়িল। চক্ষুর সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকা আরও বৃহৎ দেখাইল। মুহুর্তের জন্য আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ কি সত্যই সোমদত্তা, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম? যে চিন্তা অহরহ আমার অন্তরকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই চিন্তার বস্তু কি মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল? কিন্তু এ ভ্রম অল্পকালের জন্য, আকস্মিক আঘাতে বিপন্ন বুদ্ধি পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, সোমদত্তার হস্তে প্রদীপ থারথার করিয়া কাঁপিতেছে,

এখনই পড়িয়া নিবিয়া যাইবে। আমি তরবারি কোষাবদ্ধ করিয়া তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইলাম,–"তাহার মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলাম, "এ কি! পরমভট্টারিকা মহাদেবী সোমদত্তা!"

সোমদত্তা ভয়সূচক অস্ফুটধ্বনি করিয়া নিজ বক্ষে হস্তার্পণ করিল। পরীক্ষণেই ছুরির একটা ঝলক এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষাগ্র অস্ত্র আমার বস্ত্রাবৃত লৌহজালিকের ব্যবধানপথে বক্ষের চর্ম স্পর্শ করিল। ভিতরে লৌহজালিক না থাকিলে সোমদত্তার হস্তে সেদিন আমার প্রাণ যাইত। আমি ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ কাটিতে রাখিলাম, তারপর সবলে দুই বাহু দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার কর্ণে কহিলাম, "সোমদত্তা, কুহকিনী, আজ তোমাকে পাইয়াছি।"

তৈলপ্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

জলবদ্ধ ব্যাস্ত্রীর মতো সোমদত্তা আমার বাহুমধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নখ দিয়া আমার মুখ ছিঁড়িয়া দিল। আমি আরও জোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভালো, ভালো। তোমার নখর-ক্ষতি কাল চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইব।"

সহসা সোমদত্তার দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল; অন্ধকারে ভাবিলাম, বুঝি মূৰ্ছা গিয়াছে। তারপর তাহার দ্রুত কম্পনে ও কণ্ঠোত্থিত নিরুদ্ধ শব্দে বুঝিলাম, মুছা নহে—সোমদত্তা কাঁদিতেছে। কাঁদুক—কামিনীর ক্রন্দন আমার জীবনে এই প্রথম নহে। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। আমি তাহাকে কাঁদিতে দিলাম।

কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবার পর সোমদত্তা সোজা হইয়া দাঁড়াইল; অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "তুমি কে? কেন আমাকে ধরিয়াছ? শীঘ্র ছাড়িয়া দাও!"

আমি আলিঙ্গন শিথিল করিলম না, বলিলাম, "আমি কে শুনিবে? আমি চক্রায়ুধ ঈশানবম-—তোমার চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য, উপস্থিত দুর্গ-তোরণের রক্ষক। আরও অধিক পরিচয় চাও তো বলি, আমি সোমদত্তার রূপের মধুকর। যেদিন তটিনীতিটে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, ছলনাময়ী, সেইদিন হইতে তোমার রূপযৌবনের আরাধনা করিতেছি!"

অনুভব করিলম, সোমদত্ত শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "চিনিয়াছ দেখিতেছি! হাঁ, আমি সেই বিট, যে স্বর্গের পারিজাত দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল।"

সোমদত্ত কহিল, "পাপিষ্ঠ, আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ রাজ-আদেশে তোমার মুণ্ড যাইবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পাপিষ্ঠ, তোমাকে ছাড়িব না। ছাড়িয়া দিলে পট্টমহাদেবীর আদেশে আমার মুণ্ড যাইতে পারে। তুমি নিশীথ সময়ে রাজপুরী ছাড়িয়া কি জন্য বাহিরে আসিয়াছ? প্রকারের নিভৃত স্থানে প্রদীপ লইয়া কি করিতেছিলে?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সোমদত্তা উত্তর করিল, "আমি রাজার অনুমতি লইয়া পুরীর বাহিরে আসিয়াছি।"

"এমন কখনো হইতে পারে না।"

"বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি চন্দ্রগুপ্তকে সত্যই ভালবাস, তবে তাহার সর্বনাশ করিতেছ কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সোমদত্তা বলিল, "চন্দ্রবর্মা আমার পিতা।"

ঘোর বিস্ময়ে কহিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার কন্যা?"

অধোমুখে সোমদত্ত কহিল, "হাঁ, কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভজাত।"

"বুঝিয়াছি।"

"তুমি নরাধম, কিছু বুঝি নাই। আমি শৈশব হইতে রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা।"

"ভালো, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, পিতার জন্য তুমি স্বামীর সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝিয়া লও। আমি গৌড় চাহি না, চম্পা চাহি না, কাশী-কোশল কিছুই চাহি না—আমি তোমাকে চাই। অস্বীকার করিলে কোনও ফল হইবে না-উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত তোমার এই অভিসার-কথা জানিতে পরিবে।"

সোমদত্তা কম্পিত স্বরে কহিল, "ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা করিয়া ঐ পরিখার জলে ফেলিয়া দাও, আমি কোনও কথা কহিব না। কিন্তু মহারাজকে এ কথা বলিও না। পুরুষের মন সর্বদা সন্দিগ্ধ, তিনি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবেন না, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন। স্বীকার কর, বলিবে না?"

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে? কহিলাম, "উত্তম, বলিব না। কিন্তু আমার পুরস্কার?"

সোমদত্তা নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুরস্কার?"

তথাপি সোমদত্তা মৌন।

আমি তখন ক্ষিপ্ত। নির্মম পীড়নে তাহার দেহলতা বিমথিত করিয়া অধরে চুম্বন করিলাম।

বলিলাম, "সোমদত্তা, তোমার রূপের আগুনে আজ আপনাকে আহুতি দিলাম।"

সোমদত্তা যেন মর্মতন্তু ছিঁড়িয়া কথা কহিল, "শুধু তুমি নহ, তুমি, আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে!"

২.

নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির উপর মগধের প্রাচীন রাজপুরী। এই পাদক্রোশ

ভূমি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের উপর কারুকার্যোশাভিত উচ্চ পাষাণ-তোরণ। এই তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই বহুস্তম্ভযুক্ত বিচিত্র দ্বিতল মন্ত্রগৃহ। তাহার পশ্চাতে মহলের পর মহল, প্রাসাদের পর প্রাসাদ,-কোনটি কোষাগার, কোনটি অলংকারগৃহ, কোনটি দেবগৃহ, কোনটি চিত্রভবন। মধ্যে কুঞ্জবেষ্টিত কমল-সরোবর—তাহাতে সারস মরাল প্রভৃতি পক্ষী ও বহুবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডিনিবদ্ধ মগধেশ্বরের অন্তঃপুর। সেতু পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। সেতুমুখে কাঞ্চুকী সেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে। ভিতরে সুন্দর কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ সৌধ সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন ইন্দ্রভুবন রচনা করিয়াছে। এখানে সকল গৃহই ত্রিতল, প্রথম তল শ্বেত-প্রস্তরে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দারুনিমিত।

এই পুরী চন্দ্রগুপ্তের নির্মিত নহে, মৌর্যকালীন প্রাচীন রাজভবন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র গুপ্ত ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকার করিয়াই রাজপুরীর যাহা সারবস্তু সেই মোহনগৃহ সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মোহনগৃহ রাজভবনের একটি গোপন কক্ষ, দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতোই, কিন্তু ইহার প্রাচীর ও হর্ম্যতলে নানা গুপ্তদ্বার থাকিত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ভু-নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীর বাহিরে যাওয়া যাইত; এমন কি ঘোর বিপদ-আপদের সময় দুর্গের বাহিরে পলায়ন করাও চলিত। এই মোহনগৃহ প্রত্যেক রাজপুরীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; স্বয়ং রাজা এবং পট্টমহিষী ভিন্ন ইহার সন্ধান আর কাহারও জানা থাকিত না। মৃত্যুকালে রাজা পুত্রকে বলিয়া যাইতেন।

এই রাজপ্রাসাদে পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রভাতে আমি কিছু গোপন অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মন্ত্রগৃহ,–বহুজনাকীর্ণ। সচিব, সভাসদ, সেনানী, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক—সকলেই উপস্থিত; সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন। চারিদিক হইতে তাহাদের মৃদুজল্পিত গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। সভার কেন্দ্রস্থলে রত্নসিংহাসনে বসিয়া কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমি সভায় প্রবেশ করিতে চন্দ্রগুপ্ত একবার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট ভাব-যেন কিছুতেই আসে যায় না। আমি সম্ভ্রম দেখাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলম, চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লাইল। আমার হাসি আসিল, মনে মনে বলিলাম, ‘চন্দ্রগুপ্ত! যদি জানিতে!...”

রাজ-সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্তম্ভের আড়ালে সন্নিধাতার সহিত দেখা হইল। সর্বদা রাজ-সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পরিচযা করা সন্নিধাতার কার্য। নানা কারণে এই সন্নিধাতার সহিত আমার কিছু প্রণয় ছিল; অনেকবার রাজপ্রাসাদের অনেক গূঢ় সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলম, “বল্লভ, খবর কি?”

বল্লভ বলিল, “নূতন খবর কিছুই নাই। মহারাজ আজ পত্রচ্ছেদ্যকালে বলিতেছিলেন যে, মোহনগৃহের সন্ধান জানা থাকিলে এ পাপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।”

আমি বলিলাম, ‘সংসারে এত বৈরাগ্য কেন?”

বল্লভ চোখ টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “সংসারের সকল বস্তুতে নয়!—সে যাক, তোমায় বহুদিন দেখি নাই, সভায় আস না কেন?”

আমি বলিলাম, ‘দিনরাত গৌতম-দ্বারে পাহারা—সময় পাই না।—বিরোধবিমর্ণ কোথায় বলিতে পার? সভায় তো তাঁহাকে দেখিতেছি না।”

বল্লভ বলিল, "মহাবলাধিকৃত উপরে আছেন, সান্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে কি পরামর্শ হইতেছে।"
"আমারও কিছু পরামর্শ আছে"—বলিয়া সোপান অতিবাহিত করিয়া আমি উপরে গেলাম। বিরোধবমর্ণ তখন গুপ্তসদস্যগৃহে বসিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের সহিত চুপিচুপি কথা কহিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলাম, "এরূপভাবে কতদিন চলিবে? দুর্গে খাদ্য নাই, পানীয় নাই; এক দীনারের কমে আঢ়ক পরিমাণ মাধবী পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে মরিত কোনও কথা ছিল না; কিন্তু শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোনও চেষ্টাই নাই। কেবলমাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল দর্শিবে? নাগরিকগণ নানা কথা বলিতেছে—দুর্গরক্ষীরাও সন্তুষ্ট নয়।"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যায় চণ্ডপালের মদিরা গৃহে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, অনেকেই বলাবলি করিতেছে—চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে শূন্য উদর লইয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুর্গ একদিন তাহারা অধিকার করিবেই। সুতরাং বাধা না দিয়া নির্বিবাদে আসিতে দেওয়াই সুবুদ্ধি—তাহাতে তাহাদের নিকট সদব্যবহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"

সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাবলাধিকৃত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। বিরোধবর্মা কহিলেন–"চন্দ্রবমর্ণ পাটলিপুত্র অধিকার করিতে পরিবে না, তাহার দিগ্বিজয়যাত্রা এইখানেই শেষ হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু-"

বাধা দিয়া বিরোধবর্মা বলিলেন, "ইহার মধ্যে কিন্তু নাই। জানিয়া রাখ, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবিমী লাঙ্গুল উচ্চে তুলিয়া মগধ হইতে পলায়ন করিবে। ইচ্ছা হয়, তুমি তার পশ্চাদ্ধাবন করিও।"

ভিতরে কিছু কথা আছে বুঝিলাম। কি কথা জানিবার জন্য পুনশ্চ বলিলাম, "কেমন করিয়া এই অঘটন সম্ভব হইবে জানি না। দশ দিনের মধ্যে নগর শ্মশানে পরিণত হইবে। তখন চন্দ্রবর্মা রহিল কি পলাইল, কে দেখিতে যাইবে?"

কোথা হইতে খাদ্য আসিবে! কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম, "কিন্তু খাদ্য পাইলেই কি চন্দ্রবর্মাকে বিতাড়িত করা যাইবে?"

বিরোধবর্মা কহিলেন, "খাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, কল্য হইতে সকলে প্রচুর খাদ্য পাইবে।"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে কোথা হইতে খাদ্য আসিবে! কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম, "কিন্তু খাদ্য পাইলেই কি চন্দ্রবর্মাকে বিতাড়িত করা যাইবে?"

বিরোধবর্মা বলিলেন, "বলিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে চন্দ্রবর্মাকে তাড়াইব।"

"কিন্তু এই দশ দিন প্রজাদের কি বলিয়া বুঝাইয়া রাখিবেন? প্রজা ও রক্ষিসৈন্য মিলিয়া যদি মাৎসন্যায় করে?"

"মাৎস্যন্যায়!"–বিরোধব্যমা গর্জিয়া উঠিলেন, 'চক্রায়ুধ, যে যোদ্ধা শত্রুকে দুর্গ-সমর্পণের কথা চিন্তা করিবে তাঁহাকে শূলে দিব, যে প্রজা মাৎস্যন্যায়ের কথা উচ্চারণ করিবে তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া পরিখার কুম্ভীরের মুখে ফেলিয়া দিব। মাৎস্যন্যায়!—এখনো আমি বাঁচিয়া আছি।" ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি যাও, যে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে বলিও

অন্তরীক্ষপথে বাত আসিয়াছে', চন্দ্রবর্মার উচ্ছেদ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।”

অন্তরীক্ষ-পথে! আমি উঠিলাম। উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, সান্ধিবিগ্রহিক আমাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, “চক্রায়ুধ! যাহা শুনিলে, তাহা হইতে যদি কিছু অনুমান করিয়া থাক, তাহা নিজ অন্তরে রাখিও। মন্ত্রভেদে রাজ্যের সর্বনাশ হয়।”

“যথা আজ্ঞা”—বলিয়া মনে মনে হাসিয়া আমি বিদায় লইলাম।

সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল। গতরাত্রির সংকেতস্থানে

আমি পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলাম, প্রদীপ হস্তে ধরিয়া ভুবনমোহিনীর ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম। সোমদত্তা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া আমার আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করিল।

এক রাত্রির মধ্যে কি পরিবর্তন! নারীর মন এমনই বটে—কাল যে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, আজি সে নাগরের প্রেমে পাগল! আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, তাই বিস্মিত হইলাম না। স্ত্রীজাতি যখন দেখে কুল গিয়াছে, তখন প্রাণপণে নাগরকে ধরিয়া থাকে; দু'কুল হারাইয়া ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইতে চাহে না।

আমি বলিলাম, “সোমদত্তা, চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে আছে কি?”

সোমদত্তা দুই মৃণালভুজে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ আনিয়া মৃদু সলজ স্বরে কহিল, “আগে জানিতাম না, এখন বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন জগতে অন্য পুরুষ নাই।”

সোমদত্তার কথা, তাহার সম্পর্শ, তাহার দেহসৌরভ আমার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া হর্ষের প্লাবন আনিয়া দিল। অনির্বচনীয় সুখের মাদকতা মস্তিষ্ককে যেন অবশ করিয়া ফেলিল। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এমনই বুঝি নারী পুরুষকে বশ করিয়া রাখিয়াছে!

আমি বলিলাম, “সোমদত্তা, প্রিয়তমে, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে, অনন্যভাবেই চাই। রাত্রিতে চোরের মতো লুকাইয়া এই ক্ষণিকের মিলন—ইহাতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে না।”

সোমদত্তা আমার স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, “তাহা কি করিয়া হইবে, প্রাণাধিক? আমি যে রাজপুরীর পুরন্ধ্রী—চন্দ্রগুপ্তের বনিতা।”

বহুক্ষণ দুইজনে নীরব রহিলাম। সোমদত্তার মতো নারীকে যে পায় নাই, সে জানে না, তাহার জন্য পুরুষের মনে কি তীব্র—কি দুবার আকাঙক্ষা জাগিতে পারে। আমিও যতদিন তাহাকে দূর হইতে কামনা করিয়াছিলাম, ততদিন তাহার এই দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি নাই। সোমদত্তাকে লাভ করিবার বাসনা অপেক্ষা তাহাকে একান্তে নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার আকাঙক্ষা শতগুণ প্রবল! তাহার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা তাহার অলৌকিক যৌবনশ্রীরও অতীত, যাহা ভোগে অবসাদ আসে না, ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার অগ্নিকে আরও

পারে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে তিলমাত্র দ্বিধা করে না।

“শত্রুর নিকট কাল কি সংকেত পাঠাইতেছিলে?”

সোমদত্তা আমার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিল। আমার মুখের উপর দুই চক্ষু পাতিয়া যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া লইল। সেখানে কি দেখিল জানি না, বলিল, "দুর্গের দুই একটা কথা জানাইতেছিলাম।"

"তাহা না বলিলেও বুঝিয়েছি। কি কথা?"

"নগরে খাদ্য নাই, এই সংবাদ দিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "ভুল সংবাদ দিয়াছ—কাল প্রভাত হইতে নগরে আর অন্নাভাব থাকিবে না।" সোমদত্ত চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি! কোথা হইতে খাদ্য আসিবে?"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না! বোধ হয় কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পথে বাহির হইতে খাদ্যাদি। আসিবে।"

"সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?"

"তাহা কি করিয়া জানিব? এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত বলিতেছি, নগরে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, সে আয়োজন হইয়াছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই চন্দ্রবর্মার্থ বাহির হইতে আক্রান্ত হইবেন-বোধ হয়। বৈশালী হইতে সৈন্য আসিতেছে।"

"সত্য বলিতেছ? আমাকে প্রতারণা করিতেছ না?"

"সত্য বলিতেছি, আজ বিরোধবর্মার মুখে এ কথা শুনিয়াছি।"

সোমদত্ত ললাটে করাঘাত করিল; বলিল, "হায়! কাল এ কথা শুনি নাই কেন? শুনিলে প্রাণ দিতাম, তবু..."

সোমদত্ত বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু আমার দিকে ফিরাইল। দীর্ঘকাল মৌন থাকিয়া শেষে বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, ললাট-লিখন কে খণ্ডাইবে? বেশ্যা-কন্যার বুঝি ইহাই প্রাক্তন!"

আমি বাহু দ্বারা তাহার কাটিবেষ্টন করিয়া সোহাগে গদগদ স্বরে বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রেয়সী, কেন বৃথা খেদ করিতেছি? তুমি আমার। চক্রায়ুধ ঈশানবম তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ কুকুর, জলে ঝাঁপ দিবে। চন্দ্রগুপ্তের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তোমার জন্য আমি তার সর্বনাশ করিব।"

"তুমিও চন্দ্রগুপ্তের সর্বনাশ করিবে?"

"করিব। তুমি পারি, আর আমি পারি না? চন্দ্রগুপ্ত আমার কে?"

"সখা!"

"সখা নয়। আমি তার প্রমোদের সহচর, স্তাবক সভাসদ, বিট-বিদূষক মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত একদিন আমার মুখের গ্রাস কড়িয়া লইয়াছিল, আমিও লইয়াছি। যার অঙ্ক'লক্ষ্মীকে কড়িয়া লইয়াছি, তার সঙ্গে আবার সখ্য কিসের? এখন আমরা দুজনে মিলিয়া তার উচ্ছেদ করিব।"

কিছুক্ষণ নিবাক থাকিয়া সোমদত্তা প্রশ্ন করিল, "কি করিতে চাও?"

"শুন বলিতেছি। প্রভাতে বিরোধবর্মার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে অনুমান হয় যে, আজ

হইতে দশ দিনের মধ্যে লিচ্ছবিদেশ হইতে পাটলিপুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্য আসিবে-পারাবত-মুখে এই সংবাদ আসিয়াছে। চন্দ্রবমর্ণ যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে চান, তবে তৎপূর্বেই করিতে হইবে, লিচ্ছবিরা আসিয়া পড়িলে আর তাহা সুসাধ্য হইবে না। তখন নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে। এদিকে নগরের খাদ্যাভাবও ঘুচিয়াছে, সুতরাং বাহুবলে এই দশ দিনের মধ্যে দুর্গ জয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি?"

"কি উপায়?"

"বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে?"

"আমি করিব। কিন্তু পরিবর্তে চন্দ্রাবামা আমাকে কি দিবেন?"

"যাহা পাইয়াছ তাহাতে তৃপ্তি নাই?"

"না। কাল বলিয়ছিলাম বটে, রাজ্য সিংহাসন চাহি না, কিন্তু তাহা ভুল। রাজ্য না পাইলে তোমাকে পাইয়াও আমার অতৃপ্তি থাকিয়া যাইবে। তুমি রাজ-ঐশ্বর্যের স্বাদ পাইয়াছ—অল্পে কি তোমার মন উঠিবে?"

"তা বটে, অল্পে আমার ক্ষুধা মিটিবে না!...কৃতঘ্নতার মূল্য কি চাও?"

"আমি সব স্থির করিয়াছি। তুমি দীপসংকেতে চন্দ্রবর্মাকে সমস্ত সংবাদ দাও,—জানাও যে বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন দুর্গ অধিকার হইবে না। তাঁহাকে এ কথাও বল যে, একজন দ্বারপাল সেনানী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে মগধের সিংহাসন দিতে হইবে।"

সোমদত্তা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর হাসিয়া উঠিল। দীপের কম্পমান আলোকে সে হাসি অদ্ভুত দেখাইল। বলিল, "বেশ, বেশ! আমিও তো ইহাই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম পিতাকে তুষ্ট করিয়া এক জনের জন্য মগধের সিংহাসন ভিক্ষা মাগিয়া লইব, এক স্পর্ধিতা দুবিনীতা নারীর দর্পচূর্ণ করিব। কিন্তু এই ভালো। তোমার ও আমার ষড়যন্ত্রে পিতা দুর্গ অধিকার করিবেন, তারপর তুমি সিংহাসনে বসিবে, আর আমি—আমি তোমার পট্টমহিষী হইব। এই ভালো!"—বলিয়া সোমদত্তা আবার হাসিল।

আমি বলিলাম, 'চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে হইবে। তাহকে বাঁচিতে দিয়া কোনও লাভ নাই। পরে গণ্ডগোল বাধিতে পারে। একটা সুবিধা আছে, চন্দ্রগুপ্ত পলাইতে পরিবে না, সে মোহনগৃহের সন্ধান জানে না।"

চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সোমদত্তার মনে কোনও মমতা আছে কি না দেখিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল না, বরঞ্চ মুখ ও অধরোষ্ঠ আরও কঠিনভাব ধারণ করিল। সে স্থির নিষ্করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনগৃহ কি?"

মোহনগৃহ কি, বুঝাইয়া দিলে সোমদত্তার মুখে কিছু উৎফুল্লতা দেখা দিল। সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী পুত্র লইয়া পলাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার মনে সুখ ছিল না; এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিও না, তোমাতে আমাতে নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগ করিব।"

“আর চন্দ্রগুপ্ত?”

“সে ভার আমার। আমি তার ব্যবস্থা করিব।”

ঊষার সূচনা করিয়া শীতল বায়ু আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। পূর্বগগনে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত শশিকলা রোগপাণ্ডুর মুখ তুলিয়া চাহিল। আমি বলিলাম, ‘আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বেলা সংকেত পাঠাও।”

সোমদত্তা প্রদীপ লইয়া প্রাকারের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসারিত-হস্তে কিছুক্ষণ প্রদীপ ধরিয়া থাকিয়া মুখে নিশাচর পক্ষীর মতো একপ্রকার শব্দ করিল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, পরিখার পরপর হইতে অস্পষ্ট উত্তর আসিল। তখন সোমদত্তা প্রদীপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাপসীর মতো আত্মসমাহিত মুখ, নিশ্চল তন্ময় চক্ষু, সোমদত্তা দীপরশ্মির সাহায্যে সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করিল।

সংবাদ শেষ হইলে বাহিরের অন্ধকার হইতে আবার শব্দ আসিল—এবার পাপিয়ার উচ্চতান–শব্দ স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল।

সোমদত্তা প্রদীপ নামাইয়া বলিল, “কল্য উত্তর পাইবে।”

৩.

নিশাবসানে পৌরজন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দেখিল, নগরের হট্টে রাশি রাশি খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, শালি-তণ্ডুল, গোধূম, চণক, শাক-সব্জী—কোনও বস্তুরই অভাব নাই। কোথা হইতে খাদ্য আসিল, কেহ জানিল না। শুধু দেখা গেল, বুদ্ধ তথ্যগতের পাষাণময় বিহারের অভ্যন্তর হইতে এই খাদ্য-স্রোত নিঃসৃত হইতেছে। নাগরিকগণ উর্ধ্ব কণ্ঠে সৌগতের জয়ঘোষণা করিতে করিতে হট্টের অভিমুখে ছুটিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখন মল্লাগাহের সুচিক্কণ শীতল মণি-কুট্টিমের উপর শিয়ান ছিলেন, দুই জন নিহাপিত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি মর্দন করিয়া দিতেছিল। নাগরিকদের এই আনন্দনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মুদিত চক্ষু ঈষান্মাত্র উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লভ, কিসের চিৎকার? চন্দ্রবর্মা কি দুর্গপ্রবেশ করিল?"

সন্নিধাতা বল্লভ সুবর্ণস্থলীর উপর স্ফটিকপত্রপূর্ণ ফলান্নারস লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—মহারাজ স্নানান্তে পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিকেন। সে বলিল, "না অজজ, বহুদিন পরে পৌরজন খাদ্য পাইয়াছে, তাই মহারাজের জয়-ধ্বনি করিতেছে।" চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হইতে আসিল?" বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে; বলিল, "বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাঁহাই বিতরণ করিতেছেন।"

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হইতে আসিল?"

বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে; বলিল "বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাহাই বিতরণ করিতেছেন।"

মহারাজ আর প্রশ্ন করিলেন না, পুনশ্চ চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, "ভাল, মহাদেবীকে সমাচার দাও। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।"

মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বল্লভ অনুধাবন করিল না, মহাদেবী বলিতে প্রেয়সী সোমদত্তাকেই বুঝিল। "যথা আজ্ঞা!"—বলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, অসংবৃতকুন্তলা এক তরুণী দাসী দ্রুতপদে বহির্মুখে যাইতেছে। বল্লভ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, বলিল, "জয়ন্তী, তোমার কেশবেশ যেরূপ বিস্রস্ত, বাহিরে গেলে লোকে নিন্দা করিবে!"

জয়ন্তী মথিত-কজ্জল চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, "কি প্রয়োজন তাই বল না, রসিকতার সময় নাই। আমি কাজে যাইতেছি।"

বল্লভ বলিল, "কাজ পরে করিও, এখন অন্দরে ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া তাহার মুখে সংবাদ পঠাইয়া দিল।

জয়ন্তী সংবাদ লইতেই আসিতেছিল, ফিরিয়া গিয়া সোমদত্তাকে সকল কথা জানাইল।

সোমদত্তা তখন শীতল হর্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর উপর মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল। কি গহন, কি কুটিল তাহার চিন্তা, তাহা কে বলিবে? দাসীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। দুই চক্ষু কালিমাবেষ্টিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রভাময় হইয়াছে, শিশির-কালের প্রস্ফুট হিমচম্পকের ন্যায় কপোল দুইটি পাণ্ডুর। রূপের বুঝি অন্ত নাই। দাসী এই ক্লান্ত-সন্তপ্ত সৌন্দর্যের সম্মুখ হইতে বোধ করি লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল; সোমদত্তা

ডাকিল, “জয়ন্তী!”

দাসী ফিরিয়া আসিয়া সসন্ত্রমে বলিল, “অজ্জা!”

অধোমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোমদত্তা বলিল, “তুই একবার বাহিরে যা। বৌদ্ধ-বিহারে গিয়া শ্রমণাচার্য ভিক্ষু অকিঞ্চনকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। বলিবি যে ভিক্ষুণী দীপান্বিতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে। আর কঞ্চুকী যদি তাঁর পুরপ্রবেশে বাধা দেয়, এই মুদ্রা দেখাস।”–বলিয়া আপন কণ্ঠের রত্নহার হইতে সুবর্ণমুদ্রা খুলিয়া দাসীর হস্তে দিল।

জয়ন্তীর মুখ পাংশু হইয়া গেল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল, “কিন্তু অজ্জা, কুমারদেবী জানিতে পারিলে—”

সোমদত্ত কহিল, “ত্যক্ত করিস না, যা বলিলাম কর।”

জয়ন্তী প্রস্থান করিল, মনে মনে বলিতে বলিতে গেল, “তোমার আর কি! অন্দরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডাকিয়াছি শুনিলে পট্টদেবী আমার মাথাটি খাইবেন।”

ভিক্ষু অকিঞ্চনকে লইয়া যখন জয়ন্তী ফিরিল, তখন সোমদত্ত স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বসিয়াছে। ললাটে কুকুম-তিলক পরিয়াছে, বক্ষে কাচুলি বাঁধিয়া উচ্ছল দেহলাবণ্য সংযত করিয়াছে। ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তাকে আশীবাদ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসু নোত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সংঘস্থবিরের বয়স হইয়াছে, মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, শান্ত সৌম্য মূর্তি। কৃচ্ছসাধনের ফলে কিছু কৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডলে ব্রহ্মচর্যের নির্মল দীপ্তি জাজ্বল্যমান।

সোমদত্তা জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। জয়ন্তী প্রস্থান করিলে সে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, “অহঁৎ, আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া সংঘারামে গিয়েছিলাম-ক্ষমা করুন!”

অকিঞ্চন কহিলেন, “আত্মগোপন করিয়া যে আর্তের সেবা করে, সিদ্ধার্থ তাহাকে অধিক কৃপা করেন।”

সোমদত্ত কহিল, “আজ রাত্রে বোধ হয় সংঘারামে যাইবার অবকাশ হইবে না। তাই অজা কুমারদেবীর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ জানিয়াও আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।”

অকিঞ্চন কহিলেন, “সময় উপস্থিত হইলে ভগবান শাক্যসিংহ কুমারদেবীকে সুমতি দিবেন। …তোমার জিজ্ঞাস্য কি?”

সোমদত্ত কহিল, “শুনিলাম, নগরে খাদ্য আসিয়াছে; এ কথা সত্য?”

“সত্য।”

“কি করিয়া আসিল?”

ভিক্ষু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, “তথ্যগতের কৃপায়।”

সোমদত্ত ঈষৎ অধীর হইয়া বলিলেন, “তাহা জানি। কিন্তু কোথা হইতে কোন পথে আসিল?”

অকিঞ্চন মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সংঘের পথে।"

শিরঃসঞ্চালন করিয়া সোমদত্ত কহিল, "তাহাও জানি; খাদ্য সংঘারামে সঞ্চিত ছিল?"

"না।"

"তবে?"

"এ অতি গূঢ় বৃত্তান্ত। দীপান্বিতে, তুমি কৌতুহল প্রকাশ করিও না,–আমি বলিব না।"

"তবে আমিই বলিতেছি। সংঘমধ্যে কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পথে দুর্গের বাহির হইতে খাদ্য আসিতেছে–সত্য কি না?"

ইতস্তত করিয়া ভিক্ষু কহিলেন, "সত্য। জান যদি, প্রশ্ন করিতেছ কেন?"

"জানি না, অনুমান করিয়াছি মাত্র। অর্হৎ, কন্যার প্রতি একটি অনুগ্রহ করুন। কি করিয়া কবে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, আমাকে বলুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সংঘাচার্য বলিলেন, "ভাল, শুন। এই সুড়ঙ্গের সন্ধান একপক্ষ পূর্ব পর্যন্ত আমি অথবা অন্য কেহ জানিত না। আমার পূর্ববর্তী সংঘস্থবির নিবণের পূর্বে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহার কথা আমাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।"

নির্নিমেষ চক্ষুদ্বয় ভিক্ষুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সোমদত্তা শুনিতে লাগিল।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিলেন, "সংঘের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত আছে, তাহার উপরে আর একটি কক্ষ আছে, তুমি দেখিয়া থাকিবে। কক্ষটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কদাচি আমি মননাদির জন্য উহা ব্যবহার করিয়া থাকি। গত পূর্ণিমা-তিথিতে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে এবং ছাদের মধ্যস্থলে যে প্রস্তরের ধর্মচক্র ক্ষোদিত আছে, তাহার উপর মধুমক্ষিকা চক্রনির্মাণ করিয়াছে। ঘরটিকে মলনির্মুক্ত করিবার মানসে আমি প্রথমে একটি বংশদণ্ডাগ্রে মশাল যোজিত করিয়া ধূম প্রয়োগ দ্বারা মধুমক্ষিকাগুলিকে বিদূরিত করিলম, তারপর মধুচক্রটি স্থানচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে বংশদণ্ডদ্বারা উহা তাড়িত করিবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে বংশের অগ্রভাগ প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষপ্রাচীরের এক স্থানে প্রস্তর সরিয়া গিয়া একটা চতুষ্কোণ গহ্বর দেখা দিল। আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই রন্ধ্রটি পরীক্ষা করিলম, দেখিলাম, অন্ধকার মধ্যে সোপান নামিয়া গিয়াছে।

"পাছে অন্য কেহ আসিয়া পড়ে, এ জন্য তখন আর কিছু করিলম না—কক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, প্রদীপ লইয়া কক্ষের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলম। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত সুড়ঙ্গ, অতিশয় সংকীর্ণ ও অনুচ্চ, মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। অর্ধ ক্রোশান্তরে বায়ুপ্রবাহের জন্য কূপ আছে–সেই কূপ সকল লঙঘন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমি এইভাবে বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়াও সুড়ঙ্গের শেষ পাইলাম না। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, সে রাত্রিতে ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর উপযুপরি পঞ্চরাত্রি চেষ্টার পর ষষ্ঠরাত্রিতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। কুক্কুটপাদ বিহারের অঙ্গনে গিয়া সুড়ঙ্গ শেষ হইয়াছে..."

সংহত নিশ্বাসে সোমদত্তা বলিল, "তারপর?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অকিঞ্চন কহিলেন, "কুকুটপাদ বিহারের পূর্বশ্রী আর নাই, এখন উহা জনহীন ভগ্নপ্রায়, শ্বাপদের বাসভূমি। কিন্তু গোতমের করুণার উৎস এখনো শতমুখে উৎসারিত হইতেছে। তাই ভগবান পথ দেখাইয়া দিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া সান্ধিবিগ্রহিককে সংবাদ দিলাম, বলিলাম, সংঘের পথেই বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণ হউক।"

ভিক্ষু নীরব হইলেন। সোমদত্তা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ। এইভাবে কাটিবার পর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। তখন সোমদত্তা যুক্তপাণি হইয়া বলিল, "শ্রীমন, আর একটি প্রশ্ন আছে। এই রাজপুরী যিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি কি বৌদ্ধ ছিলেন?"

অকিঞ্চন কহিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি, অশোক প্রিয়াদশী এই পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সংঘারামও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।"

সোমদত্তা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভগবন, আশীবাদ করুন, যেন পূর্ণমনোরথ হইতে পারি।"

হাস্যমুখে অকিঞ্চন কহিলেন, "সুমঙ্গলে, গোতমের ইচ্ছায় তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে—গোতম অন্তর্যামী।"

সংঘস্থবির বিদায় হইলে সোমদত্তা কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিল। ধর্মচক্র! ধর্মচক্র! কিন্তু পুরীমধ্যে কোথাও তো ধর্মচক্র নাই। বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্তে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু ঊর্ধ্বে নিপতিত হইল। তখন বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত বক্ষে সোমদত্তা দেখিল, উচ্চ ছাদের মধ্যস্থলে রক্তপ্রস্তরে উৎকীর্ণ ধর্মচক্র—এবং তাহার কেন্দ্রমধ্যে ক্ষুদ্র সুগোল একটি ছিদ্র!

বহুক্ষণ তদাবস্থ থাকিবার পর সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তীকে ডাকিল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "জয়ন্তী, শীঘ্র যা-অস্ত্রাগার হইতে ধনুবাণ লইয়া আয়! জিজ্ঞাসা করিলে বলিস, মহাদেবী সোমদত্তা লক্ষ্যবোধ শিক্ষা করিবেন।"

শব্দতরঙ্গে অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া বাঁশি বাজিতেছিল। সোমদত্তা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া করতলে চিবুক রাখিয়া এই দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতেছিল। আমি প্রাকার-কুড্য আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বাঁশি প্রথমে বসন্ত-রাগ ধরিল; তারপর কিছুক্ষণ গুর্জরী-রিগ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আবার বসন্ত-রাগে ফিরিয়া আসিল। শেষে এই দুই রাগ ছাড়িয়া বাঁশি মালকোষ ধরিল। কত নিপুণ সুরের কৌশল, কত মীড়-গমক-ঝংকার, কত তান-লয়ের পরিবর্তন দেখাইল। তারপর সহসা বাঁশি স্তব্ধ হইল।

"বাঁশি কি বলিল?"

সোমদত্তা যেন তন্দ্রার ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিল। অতি দীর্ঘ এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি যাহা চাও পাইবে। চন্দ্রবর্মা তোমাকে মগধের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন। আগামী

অমাবস্যর রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইবার পর আমি এই প্রদীপ দ্বারা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করিব। অগ্নি যখন ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ লেহন করিবে, সেই সময় তুমি গৌতম-দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিবে। রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগই সংকেত; এই সংকেত পাইয়া চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, তুমি দ্বার খুলিয়া দিলেই তাহারা প্রবেশ করিবে। পৌরজন রাজপুরী রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকিবে, সেই অবসরে চন্দ্রবর্মা বিনা বাধায় পাটলিপুত্র অধিকার করিবেন।”

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, “অমাবস্যর রাত্রি? তার তো বিলম্ব নাই-আগামী পরশ্ব!”

“হাঁ। অধিক বিলম্বে ভয় আছে, লিচ্ছবিগণ আসিয়া পড়িতে পারে।”

ইহার পর সোমদত্তা আবার মৌন অবলম্বন করিল, করলগ্নকপোলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও সহসা কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, মানসিক উত্তেজনা রসনাকে যেন জড় করিয়া দিল। তথাপি চেষ্টা করিয়া কহিলাম, “বাঁশি তো রাগ-রাগিণীর আলাপ করিল, তুমি এত কথা বুঝিলে কি করিয়া?”

সোমদত্তা অন্যমনে কহিল, “ঐ রাগ-রাগিণীতে সংযুক্ত কথাগুলা আমার জানিত। যিনি বাঁশি। বাজাইতেছিলেন, তিনি আমার গীতাচার্য ছিলেন।”

অতঃপর আবার দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই সুকঠিন মৌন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলম, “কি ভাবিতেছ?”

সোমদত্তা মুখ তুলিয়া বলিল, “ভাবিতেছি, কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটিতে পড়িলে ভাঙিয়া শতখণ্ড হইবে; অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করিবার শক্তি ইহার আছে। এমনি কতশত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপশিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করিতেছে।”

আমি তাহার বাক্যের মর্ম বুঝিয়া হস্তধারণপূর্বক বলিলাম, “মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা, তুমি রত্নপ্রদীপ! তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হইবে।”

সোমদত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমি শ্মশানের আলো!… এখন চলিলাম, সেই অমাবস্যর রাত্রিতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। চন্দ্রবর্মাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইও, আমি মন্ত্রগৃহে প্রতীক্ষায় থাকিব।”

আমি তাহাকে সাদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলাম, “সেই দিন আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

ঈষৎ হাসিয়া সোমদত্তা বলিল, “হাঁ, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার কক্ষে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমের গন্ধে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু না খুলিয়াই ডাকিলেন, “সোমদত্তা।” উত্তর পাইলেন না। তখন নিদ্রাকষায়নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় সোমদত্তা নাই। কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, সোমদত্তাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাহিরে তখন সমস্ত পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোত্থিত নারীদের ভীত চিৎকার, গৃহপালিত

ময়ুর শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদের সচকিত আর্তস্বর এবং সর্বোপরি বিস্তারশীল। অগ্নির গর্জন নৈশ বায়ুকে বিলোড়িত করিতেছে। দারুপ্রাসাদে আগুন লাগিলে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পথ। পুরীস্থ সকলে মহাকোলাহল করিয়া নিজ নিজ মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইতেছে, লইয়া পলাইতেছে। কে পড়িয়া রহিল, রাজা-রানী কে মরিল কে বাঁচিল, কাহারও দেখিবার অবসর নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলেরই উগ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্বরা।

অগ্নি ক্রমশ আরও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এক প্রাসাদ ছাড়িয়া সংলগ্ন প্রাসাদসকল আক্রমণ করিল। বায়ুর বেগ বাড়িয়া গেল। অমাবস্যা রাত্রির মসীতুল্য অন্ধকার এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যেন বিদীর্ণ শতখণ্ড হইয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত নগর রক্তাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল!

নাগরিকগণ জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে ছুটিল। উত্তেজিত বিহ্বল নর-নারী স্খলিতবাসনে মুক্ত-কেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে জ্বলন্ত রাজ-প্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল।

সহসা বহুদূরে সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে মহাজয়ধ্বনি শ্রুত হইল। রাজপুরীর চারিপাশে সমবেত নাগরিকগণ উর্ধ্বমুখে অনলোল্লাস দেখিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে কে একজন চিৎকার করিয়া বলিল, “পালাও! পালাও! নগরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে!”-অমনই বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়া জানু ভাঙিল, কেহ জনমর্দের চরণতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রন্দন, হাহাকার এতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এবার নগরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সোমদত্তা তখন কোথায়?

সোমদত্তা তখন আলুলায়িত কুন্তলে, লুণ্ঠিত বসনে পট্টমহাদেবীর প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে। কুমারদেবীর ভবনে তখনও ভালো করিয়া আগুন লাগে নাই, কিন্তু দাসী, কিঙ্করী, প্রহরিণী—যে যেখানে ছিল সকলে পলাইয়াছে। কুমারদেবীর অরক্ষিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তা দেখিল, বিস্তৃত শয্যার উপর পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া তিনি তখনও নিদ্রিতা।

সোমদত্তা সবলে তাঁহার অঙ্গে নাড়া দিয়া বলিল, “দেবী, উঠুন, উঠুন—প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে!”

কুমারদেবী চক্ষু মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বলিলেন, “কে?”

“আমি, সোমদত্তা। আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন”—বলিয়া ঘুমন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গেল।

কুমারদেবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আমার পুত্রকে স্পর্শ করিও না। দাসীরা কোথায়?”

“কেহ নাই, সকলে প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।”

“মহলে কি করিয়া আগুন লাগিল?”

আর গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সোমদত্তা স্থিরদৃষ্টিতে কুমারদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, “আমি মহলে আগুন দিয়াছি।”

কুমারদেবী চিৎকার করিয়া কহিলেন, “স্বৈরিণী! তাহা জানি। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঘরে আনিয়াছিস তখনি তোর অভিসন্ধি বুঝিয়েছি।”

সোমদত্ত কহিল, “অজ্জা, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিদোষের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রসাদেই আজ। আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। এখন আসুন, পুরী এতক্ষণে ভস্মসাৎ হইল। আর বিলম্ব করিলে বুঝি আপনাদের বাঁচাইতে পারিব না।”

“তুই বাঁচাইবি? কেন, আমি কি আত্মরক্ষা করিতে জানি না?”

“না অজ্জা, আজ আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদের বাঁচাইতে পরিবে না।”

“তার অর্থ?”

“তার অর্থ চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এতক্ষণে বোধ করি রাজপুরী ঘিরিল।” কুমারদেবীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, “ডাকিনী! এ তোর কার্য; তুই মগধরাজ্য ছারখারে দিলি।”

সোমদত্তা স্থিরভাবে বলিল, “স্বীকার করিলাম। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে কুমারকে বাঁচাইতে পারিব না। ঐ দেখুন, অগ্নি প্রসাদ বেষ্টন করিয়াছি।”

এই সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাতায়নপথে অগ্নির আরক্ত লোলরিসনা ও কুণ্ডলিত ধূমোদাগার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোমদত্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রেগড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, “আজ আমার স্বামীর বংশধরকে বাঁচাইব বলিয়া আসিয়াছি, নহিলে আসিতাম না। আপনি থাকিতে হয় থাকুন, আমি চলিলাম”—বলিয়া স্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুমারদেবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাহু ধরিলেন, বলিলেন, “রাক্ষসী, ছাড়িয়া দে, আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দে!”

সোমদত্তা প্রজ্বলিত নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “দুর্ভাগিনী, নিজের ইষ্ট বুঝিতে পার না? আমার স্বামীর পুত্র কি আমার পুত্র নয়? এ রাজ্যে আগুন আমি জ্বলি নাই, জ্বালিয়াছে তোমার দুরন্ত অন্ধ অভিমান। সেই আগুনে তুমি পুড়িয়া মর!”

কুমারদেবীর হাত ছাড়াইয়া পুত্র বুকে লইয়া সোমদত্তা ধূম্রোন্ধকার অলিন্দের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় কুমারদেবী তাহার পশ্চাত চলিলেন।

নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোমদত্তা দেখিল, রাজা অভিভূতের ন্যায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়াআছেন—চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে, তাঁহার যেন কোনও ধারণা নাই। ঘর ধূমাচ্ছন্ন—ঘরের চারিকোণে চারিটি সুবর্ণ-প্রদীপ তখনও ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া ধনুর্বাণ লইয়া আসিল। ভালো দেখা যায় না, দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে, সোমদত্তা ধর্মচক্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শর পাথরে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার শরনিক্ষেপ করিল, ব্যর্থ শর আবার প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। অদম্য ক্রন্দনের আবেগে সোমদত্তার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবে কি গুপ্তদ্বার খুলিবে না?

এদিকে ঘরের মধ্যে অগ্নির অসহ্য উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাজা এবং কুমারদেবী

নিবাক নিষ্পলক হইয়া সোমদত্তার এই উন্মত্তবৎ কার্য দেখিতে লাগিলেন। সোমদত্তা অসীম বলে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ ধনুবাণ তুলিয়া লইল। লক্ষ্যবস্তু নিকটেই কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যায় না, হাত কাঁপে, চক্ষু কুলে কুলে ভরিয়া উঠে! বহুক্ষণ ধরিয়া, অনেকবার চক্ষু মুছিয়া, অতি সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সোমদত্তা তীর ছুড়িল। এবার আর তীর ফিরিয়া আসিল না—ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে বিধিয়া রহিল। সোমদত্তা ধনু ফেলিয়া দিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমারদেবীর নিকটে গিয়া বলিল, "অজ্জা, এইবার স্বামিপুত্র লইয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করুন। সুড়ঙ্গ নগর বাহিরে কুকুটপাদ বিহারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে শত্রু নাই, সেখান হইতে সহজেই নিরাপদ স্থানে যাইতে পরিবেন।"

চন্দ্রগুপ্ত সুড়ঙ্গমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন, "নগরের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি?"

সোমদত্ত কহিল, "প্রয়োজন আছে। শত্রু নগর অধিকার করিয়াছে।"

তখন পুত্র লইয়া দুইজনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রিয়তম! এইবার বিদায় দাও।"

সহসা চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন; ভীষণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোমদত্তা, তুমি আসিবে না?"

সোমদত্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিল; বলিল, "না প্রিয়তম, আমি আর তোমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য নাহি। কেন নহি, তাহা দেবীর মুখে শুনিও। চন্দ্রবর্মা আমার পিতা—এই কথা মনে করিয়া যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা যাও–আমি ভিন্ন পথে যাইব।"

হৃদয়-বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত ডাকিলেন, "সোমদত্তা!" দুই হস্তে কর্ণ আবরণ করিয়া সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "না, না, ডাকিও না-আমি যাইতে পারিব না। আমায় মরিতে হইবে। প্রাণাধিক, আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে লইও।"

এই বলিয়া সবলে টানিয়া সুড়ঙ্গের পাষাণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের মুখনিঃসৃত অর্ধোচ্চারিত বাণী পাষাণ-প্রাচীরে লাগিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই উত্তপ্ত হর্ম্যতলে পড়িয়া, বসুধা আলিঙ্গন করিয়া, কেশ বিকীর্ণ করিয়া, ভূতলে ললাট প্রহত করিয়া সোমদত্তা কাঁদিল।

কিন্তু তবু অগ্নি নিবিল না।

এক হস্তে মুক্ত তরবারি, অন্য হস্তে প্রজ্বলিত উল্কা লইয়া দুগবিরোধকারী সেনা গৌতম-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহাদের পুরোভাগে লৌহবমাবৃত ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণধারী ভীষণাকৃতি স্বয়ং চন্দ্রবমর্ণ। দ্বারের প্রহরীদিগকে পূর্বেই সরাইয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং একবিন্দুও রক্তপাত হইল না।

চন্দ্রবর্মা আমাকে দেখিয়া পুরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল?"

কথার ভাবটা ভালো লাগিল না। যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিলম, সে-ই বিশ্বাসঘাতক বলে! যাহা হউক, বিনীত কণ্ঠে বলিলাম, "হাঁ আমিই। সম্রাটের জয় হউক।"

চন্দ্রবর্মা নিষ্করুণ আরক্ত দুই চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি যেন গবেষণা করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভালো, সর্বাগ্রে পথ দেখাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া চল।"

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিরাট অনলস্তম্ভের মতো প্রাসাদ তখন জ্বলিতেছে—সমস্ত নগর আলোকিত করিয়াছে। আপনার প্রভায় রাজপুরী স্বয়ংপ্রকাশ।

সেনাদলের অগ্রে অগ্রে আমি চলিলাম। পথে কেহ গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, যে সম্মুখে পড়িল চৈত্রের বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতো নিমেষমধ্যে বিপরীত মুখে অন্তর্হিত হইল।

প্রাসাদের শূন্য তোরণ পার হইয়া সদলবলে সম্মুখস্থ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলম। অগ্নি তখনও মন্ত্রগৃহ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই, তবে দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে—অচিরাৎ গ্রাস করিবে।

বিশাল বহুস্তম্ভযুক্ত মন্ত্রগৃহ প্রায়ান্ধকার, জনশূন্য। কেবল তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে সোমদত্তা দাঁড়াইয়া আছে। অশনিপূর্ণ বৈশাখী মেঘের ন্যায় তাহার মূর্তি; বক্ষে পৃষ্ঠে মুক্ত কৃষ্ণ কেশজাল, ললাটে রক্তরেখা, নয়নের কৃষ্ণতারকায় জ্বালাময় বিদ্যুৎ।

বহু মশালের দীপ্তিতে মন্ত্রগৃহ আলোকিত হইল। তখন সোমদত্তা চন্দ্রবর্মাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"বৎসে! কল্যাণী!"—বলিয়া চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই ভীষণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হইল।

সোমদত্তা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "পিতা, আপনার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "পুত্রী, সে তোমারই জন্য! তোমার যোগ্য পুরস্কার আমি সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এখন এই রত্নহার গ্রহণ কর।"—বলিয়া নিজ বক্ষ হইতে অমূল্য রশ্মিকলাপ মণিহার খুলিয়া সোমদত্তার হস্তে দিলেন।

সোমদত্তা হার দুই হস্তে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; বলিল, "আর আমার পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সে কি! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

সোমদত্ত কহিল, "তা নয়, আমি বিধবা হই নাই। কিন্তু আমার স্বামীকে আর আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না। তিনি পুরী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"পুরী ত্যাগ করিয়াছেন! কোথায় গেল?"

"তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়াছি।"

"কন্যা, এ কার্য কেন করিলে?"

"দেব, এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পারিতেন,

তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নরক-যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমার কিছুই নাই—সব গিয়াছে। নারীর যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তাহা হরণ করিয়াছে।"

অঙ্গারের মতো দুই চক্ষু সোমদত্তা আমার দিকে ফিরাইল। তর্জনী প্রসারিত করিয়া বিকৃতমুখে চিৎকার করিয়া কহিল, "এই নরকের পশু আমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছে!"

অল্পকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন নীরব হইয়া গেল। আমি আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া চন্দ্রবর্মা আসিয়া আমার কেশমুষ্টি ধারণ করিলেন। অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলা আমার চক্ষু উৎপাটিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, ক্রুর হাসি হাসিয়া সোমদত্ত কহিল, "পিতা, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি পুরস্কার লাইব। এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকন্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নিরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়; মরিবার পুর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ গলিয়া খসিয়া পড়ে। আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।"

চন্দ্রবমর্ণ আমার কেশ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তাঁহাই করিব!...ইহাকে বাঁধিয়া রাখ।"

দশ জন মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিল। তখন সোমদত্তা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার প্রতি অগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে আমার মুখে একবার পদাঘাত করিল। তারপর চন্দ্রবর্মার নিকট ফিরিয়া গিয়া স্থির শান্ত স্বরে কহিল, "পিতা, এইবার পিতার কার্য করুন।"

চন্দ্রবর্মার বজের মতো কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, "কি কার্য বৎসে?"

সোমদত্তা বলিল, "এ দেহ আপনিই দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।"

পাষাণ-স্তম্ভের মতো চন্দ্রবিমী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, "আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।"

বহুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সেই ভালো, সেই ভালো।"

সোমদত্তা তখন দুই হস্তে বক্ষের কঞ্চুলী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

চন্দ্রবমর্ণ দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, "সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম।"—বলিয়া দুই পদ। পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল ঊর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।

পুনরায় যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলম, তখন দেখিলাম, রক্তচন্দন-চর্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে।

রক্তসন্ধ্যা

০১

মানুষের সহজ সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝখানে ভূমিকম্পের মতো এমন এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সেটাকে একটা অসম্ভব অঘটন। বলিয়া মনে হয়। যে গল্পটা আজ বলিতে বসিয়াছি, সেটাও একদিন এমনই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যদিও শুধু দর্শক হিসাবে ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই, তবু ইহা আমার মনের উপর এমন একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে—যাহা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুছিবে না।

যে লোকটার কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, আজি সাত দিন হইল সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই। তবে সংবাদপত্রের নথি হইতে এবং আসামীর বিচারের সময় সাক্ষীদের

মুখের যে যে কথা। এই গল্পে কাজে আসিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিব; বিশ্বাস আমি কাহাকেও করিতে বলি না এবং নিছক গাঁজা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও আমার কোনও নালিশ নাই। আমি শুধু এইটুকুই ভাবি যে, সে লোকটা মরিবার পূর্বে নিজের দোষ-ক্ষালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও এতগুলি অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া গেল কেন?

এই সময় দৈনিক সংবাদপত্র "কালকেতু'তে এই ঘটনার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি–

"গতকলা বোলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতার দুগাচরণ ব্যানার্জির লেনে এক কসাইয়ের দোকানে ভাষণ। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে { দোকানের মালিক গোলাম কাদের অন্য দিনের ন্যায় যথারীতি মাংস বিক্রয় করিতেছিল। দোকানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী ও মুসলমান খরিদার উপস্থিত ছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ফিরিঙ্গী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু গোমাংস খরিদ করিতে চাহে। তাহাকে দেখিয়াই দোকানদার গোলাম কাদের ভীষণ চিৎকার করিয়া মাংসা-কটা ছুরি হস্তে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নৃশংসভাবে তাহার বুকে, পেটে, মুখে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে; আক্রান্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন গোলাম কাদের তাহার বুকের উপর বসিয়া এক একবার ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে, "ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জনো–এই আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে।" দোকানে যাহারা ছিল সকলেই এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া পুলিসে খবর দেয়। পুলিস আসিয়া যখন গোলাম কাদেরকে গ্রেপ্তার করিল, তখনও সে মৃতদেহের উপর ছুরি চালাইতেছে ও পূর্ববৎ বকিতেছে।

"সন্দেহ হয় যে, গোলাম কাদের হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, হত ব্যক্তির সহিত পূর্ব হইতে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে না এবং তাহার স্ত্রী, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা কেহই বর্তমান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গোলাম কাদের প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে বিপত্নীক হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই।

"পুলিস-তদন্তে বাহির হইয়াছে যে, হত ব্যক্তি গোয়া হইতে নবাগত একজন পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গী, ব্যবসায় উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া এক ক্ষুদ্র হোটেলে বাস করিতেছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল ডিরোজা।

"গোলাম কাদের এখন হাজতে আছে। ডিরোজার লাস পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।"

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমার বাড়ি এবং অনেকদিন হইতে এই গোলাম কাদের লোকটার সহিত আমার মুখ-চেন্নাচিনি ছিল বলিয়াই ব্যাপারটা বেশি করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিস আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার নাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত, তাই হঠাৎ কসাইখানার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামটা উঠিয়া পড়ায় আমার মন সচকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভাস্কো-ডা-গামা' সাধারণ প্রচলিত নাম নহে; একজন অশিক্ষিত মুসলমান কসাইয়ের মুখে এ নাম এমন অবস্থায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়া কোন এক গুপ্ত রোমান্সের গন্ধে আমার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অদ্ভূত রহস্য এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে? কে এই গেব্রিয়েল ডিরোজা—যাহাকে হত্যাকারী ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া সম্বোধন করিল? সত্যই কি ইহা কেবলমাত্র এক বাতুলের দায়িত্বহীন প্রলাপ?

তা সে যাহাই হউক, কৌতুহল আমার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যেদিন এই মোকদ্দমা করোনারের কোর্টে উঠিল, সেদিন আমি একটু সকাল সকাল আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। করোনার তখনও উপস্থিত হন নাই, কিন্তু আসামীকে আনা হইয়াছে। চারিদিকে পুলিস গিসগিস করিতেছে। আসামীর হাতে হাতকড়া—একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল এবং হাত তুলিয়া সেলাম করিল। পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না, নিতান্ত সহজ মানুষের মতো চেহারা। মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোনও চিহ্নই নাই। দেখিয়া কে বলিবে, এই লোকটাই দুই দিন আগে এমন নির্দয়ভাবে আর একটা লোককে হত্যা করিয়াছে।

করোনার আসিয়া পড়িলেন। তখন কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই ডাক্তার আসিয়া এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, লাসের গায়ে সর্বসুদ্ধ সাতান্নটি ছুরিকাঘাত পাওয়া গিয়াছে। এই সাতান্নটির মধ্যে কোনটি মৃত্যুর কারণ, বলা শক্ত। কারণ, সবগুলিই সমান সাংঘাতিক।

ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হইলে জর্জ ম্যাথুস নামক একজন দেশী খ্রীস্টানকে সাক্ষী ডাকা হইল। অন্যান্য সওয়াল জবাবের পর সাক্ষী কহিল, "আমি গত দশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ গোলাম কাদোরের দোকানে মাংস কিনিয়াছি; কিন্তু কোনও দিন তাহার এরূপ ভাব দেখি নাই। সে স্বভাবত বেশ শান্তশিষ্ট লোক।"

প্রশ্ন——আপনার কি মনে হয়, সে যে-সময় হত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, সে সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না?

উত্তর—হত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল—আমাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল; কিন্তু ডিরোজাকে দেখিয়াই একেবারে যেন পাগল হইয়া গেল।

প্রশ্ন—আপনার কি বোধ হয়, আসামী হত ব্যক্তিকে পূর্ব হইতে চিনিত?

উত্তর-হাঁ। কিন্তু তাহার আসল নাম না বলিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

প্রশ্ন—ডিরোজা আক্রান্ত হইয়া কোনও কথা বলিয়াছিল?

উত্তর-না।

প্রশ্ন—আসামী মদ বা অন্য কোনও নেশা করে, আপনি জানেন?

উত্তর-আমি কখনও তাহাকে নেশা করিতে বা মাতাল হইতে দেখি নাই।

প্রশ্ন—আসামীর ভাবে ইঙ্গিতে কি আপনার বোধ হইয়াছিল যে, সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ডিরোজাকে খুন করিতেছে?

উত্তর—হাঁ। তাহার কথায় ও মুখের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে, ডিরোজা পূর্বে তাহার স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার উপর কোনও অত্যাচার করিয়া থাকিবে।

জর্জ ম্যাথুসের পরে আরও কয়েকজন সাক্ষী প্রায় ওই মর্মে এজাহার দিবার পর পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এজাহার দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোয়া হইতে খবর পাইয়াছেন যে, ডিরোজা সেখানকার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জাতিতে ফিরিঙ্গী পোর্তুগীজ—বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। সে পূর্বে কখনও গোয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই—জীবনে এই প্রথম

কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল। আসামী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, 'আসামীর আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহার বয়স অনুমান সাতচল্লিশ বৎসর। সুতরাং ডিরোজার সহিত তাহার যে পূর্বে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।'

আসামী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এবার সে কথা কহিল, বলিল, "ডা-গামাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।"

মুহুর্তমধ্যে ঘর। একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। করোনার ডেপুটি কমিশনারকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডিরোজাকে পূর্ব হইতে জানো?'

আসামী বলিল, 'ডিরোজাকে আমি কখনও দেখি নাই—আমি ভাস্কো-ডা-গামাকে চিনি। ভাস্কো-ডা-গামা ছদ্মবেশে আমার দোকানে মাংস কিনিতে আসিয়াছিল।।'

করোনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ভাস্কো-ডা-গামাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ?'

আসামী কহিল, 'প্রথম দেখি কালিকটের বন্দরে–শেষ দেখি সমুদ্রের বুকের উপর–এই পর্যন্ত বলিয়া আসামী হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে একবার 'ইয়া খোদা?'—বলিয়া দুই হাতে মুখ গুজিয়া বসিয়া পড়িল—আর কোনও কথা বলিল না।

তারপর করোনার যথাসময়ে রায় দিলেন যে, ক্ষণিক উন্মত্ততার বশে গোলাম কাদের ডিরোজাকে খুন করিয়াছে।

কোর্ট হইতে যখন বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। 'কালিকট', 'সমুদ্রের বুকের উপর'—আসামী এ সব কি বলিল? আরও কত কথা, না জানি কোন অপূর্ব কাহিনী এই মুখ নিরক্ষর কসাই গোলাম কন্দেরের বুকের মধ্যে লুকানো আছে। কারণ, সে যে পাগলামির ভান করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহ। কোনও কথা বা কাজই তাহার' পাগলের মতো নহে। অথচ দুই-একটা অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়া অতীতের পর্দার একটা কোণ তুলিয়া ধরিয়া এ কি এক আশ্চর্য রূপকথার ইঙ্গিত দিয়া গেল!

ইহার পর গোলাম কন্দেরের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। দায়রা-সোপর্দ হইয়া মামলা হাইকোর্টে উঠিলে হাইকেটের জজবাহাদুর গোলাম কাদেরকে এক মাস ডাক্তারের নজরবন্দিতে থাকিবার হুকুম দিলেন। এক মাস পরে ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল—গোলাম কদের সুস্থ সহজ মানুষ, পাগলামির চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে নাই। তারপর বিচার। বিচারে গোলাম কাদের নিজের উকিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিল, "আমি খুন করিয়াছি, সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। আবার যদি তাহার সহিত দেখা হয়, আবার তাহাকে এমনই ভাবে হত্যা করিব।"

হাইকোর্ট নিরুপায় হইয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ছিলাম। গোলাম কন্দেরের জীবননাট্যে বিচারের অঙ্কটা শেষ হইয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিচারে তাহার মুক্তির প্রত্যাশা কোন দিনই করি নাই, কিন্তু তবু অকারণে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। বুকের নিভৃত স্থানে যেন একটা সংশয় লাগিয়াই রহিল যে, এ সুবিচার হইল না, কোথায় যেন কি

একটা অত্যন্ত জরুরী প্রমাণ বাদ পড়িয়া গেল।

এইসব নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় কয়েকজন পুলিসের লোক আসামীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি গোলাম কন্দেরের মুখের দিকে চাহিতেই সে ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'বাবুজী, আপনি আমার মোকদ্দমার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আছেন, তাহ আমি দেখিয়াছি। আমি তো চলিলাম, আমার একটি শেষ আর্জি আছে-একবার জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আমার কিছু বলিবার আছে।'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় করিব।'

গোলাম কাদের হাতকড়া-বাঁধা দুই হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া জেলের গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর কি করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত দেখা করিলাম, সে বিবৃতি এখানে অনাবশ্যক। শুধু কনডেম্ড আসামীর কক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে সে আমাকে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাই বাংলাভাষায় অনূদিত করিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।–

০২

গোলাম কাদের বলিল, 'বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন। আর নাই করুন, আমি যে পাগল নাই—আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার; আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজি বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার—এই গোলাম কন্দেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মুখ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।

'তবে শুরু হইতেই কথাটা বলি। পনের-ষোল বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিতে গিয়া মারা যায়, মেয়েটিও মারা গেল। কি করিয়া জানি না, আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, কোনও দুশমন আমার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শোকের অপেক্ষা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আমার অন্তঃকরণ অধিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; সর্বদাই মনে হইত, যদি সেই অজ্ঞাত দুশমনটাকে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি অঙ্গ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ইহার প্রতিশোধ ৰল।

'এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আমার ভ্রান্তি-—সত্যের উপর ইহার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, আস্তে আস্তে শোক এবং ক্রোধ দুই ভুলিতে লাগিলাম; কিন্তু আর বিবাহ করিতে পারিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো জীবনটা আমার এমনই সহজভাবে কাটিয়া যাইত, যদি না সে-দিন অশুভক্ষণে সেই লোকটা

আমার দোকানো পদাপণ করিত।

‘শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম—এই সেই নৃশংস রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মতো সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জামান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রুর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

‘আমার জজসাহেবরা হত্যার কারণ খুঁজিতেছিলেন, কৈফিয়ৎ চাহিতেছিলেন। বাবুজী, আমি কি কৈফিয়ৎ দিব, আর দিলেই বা তাহা বুঝিত কে?

‘আপনি হয়তো বুঝিবেন। আপনার চোখে মুখে আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি। ইহাতে ফল কিছু হইবে না জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ভার লাঘব হইবে; এ ছাড়া আমার অন্য স্বার্থ নাই।

‘আমার এই কসাই।–জীবনের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করিতেছি। এবার যাহার কথা আরম্ভ করিব, তাহার নাম মির্জা দাউদ বিন গোলাম সিদ্‌কী। আমিই যে এই মির্জা দাউদ, তাহা এখন ভুলিয়া যান। মনে করুন, ইহা আর কাহারও জীবনের কাহিনী।”—

কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মতো একটি ক্ষুদ্র নগর। মোরগের ডাক যতদূর শুনা যায়, ততদূর তাহার নগর-সীমানা। নগরের পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা, কঙ্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, এবং তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন এই স্থানটুকুকে পৃথক করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে অপার সমুদ্র ভিন্ন কালিকটে প্রবেশ বা নিস্ক্রমণের অন্য সুগম পথ নাই। এই সমুদ্রপথে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী কলিকটের বন্দরে প্রবেশ করে, আবার পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। কালিকট যেন পৃথিবীর সমগ্র বণিক-সমাজের মোসাফিরখানা।

পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মুর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দাপে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প; ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত; মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন; বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম; চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরী, চারু-কেশরার পুষ্পবীজ; দক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কপূর, দারুচিনি; লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকোট স্তুপীকৃত হয়। পশ্চিম হইতে তুরস্ক, পারসিক, আরব ও মুর সওদাগর তাঁহাই স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিয়া, কেহ বা পারস্যোপসাগরের ভিতর দিয়া ইউফ্রোটেস নদের মোহনায় উপস্থিত হয়, কেহ বা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে নীলনদের সন্নিকটে গিয়া তরণী ভিড়ায়। তথা হইতে প্রাচী-র পণ্য সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কলিকটের রাজা সামরী বাণিজ্যতরণীর শুল্ক আদায় করিয়া রাজ্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। রাজকোষ সর্বদা সুবর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ। রাজ্যে কোথাও দৈন্য নাই, অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই; ইতর-ভদ্র সকলেই সুখী।

মির্জা দাউদ এই কালিকটের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁহার একুশখানি বাণিজ্যতরী আছে—‘হোয়াংহো হইতে নীলনদের প্রান্ত পর্যন্ত তাহদের গতিবিধি। যখন এই তরণী সকল শুভ্র পাল তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সমুদ্রযাত্রায় বাহিত হয়, তখন মনে হয়, রাজহংস শ্রেণী পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মির্জা দাউদ জাতিতে মুর। কালিকটে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ মুর-প্রথায় নির্মিত। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বর্তমান; কিন্তু তিনি কালিকোটকেই মাতৃভূমিত্বে বরণ করিয়াছেন। অনেক বৈদেশিক সওদাগরই এরূপ করিয়া থাকেন। মির্জা দাউদ ধর্মে মুসলমান হইলেও একপত্নীক। সম্প্রতি চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যার জন্মদিনে মির্জা দাউদ এক সহস্র তোলা সুবর্ণ বিতরণ করিয়াছেন—তারপর তাঁহার গৃহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল। নগরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

বস্তুত মির্জা দাউদের মতো সর্বজনপ্রিয় বহু-সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। এদিকে ব্যবসায়ে দিন দিন অধিক অথাগম হইতেছে। মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু পাইলে সুখী হয়, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই।

একদিন গ্রীষ্মের সায়াহ্নে পশ্চিম দিশ্বলয় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যস্ত হইতেছে। সমুদ্রের জল যতদূর দৃষ্টি যায়, রাঙা হইয়া টলমল করিতেছে। দূর লাক্ষাদ্বীপ হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত।

সমস্ত দিন গরম ভোগ করিয়া নগরের নরনারী শীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য এই সময় বন্দরের ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘটে—বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের উপর সারি সারি জাহাজ বাঁধিবার লোহার কড়া। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ওই ঘাটের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, আবার ভাঁটার সময় সিক্ত বালুকারাশি মধ্যে রাখিয়া দূরে সরিয়া যায়। এই ঘটই নগরের কর্মকেন্দ্র। ক্রয়-বিক্রয়, দর-দস্তুর, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই সকল সময় এখানে মানুষের ভিড়।

সে সময় ঘাটে একটিও নবাগত কিংবা বহির্গামী বাণিজ্যতরী ছিল না। কাজকর্ম কিছু শিথিল। নাগরিকগণ নানা বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া কেহ সস্ত্রীক সপুত্রকন্যা পদচারণা করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে। চঞ্চলমতি কিশোরগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, আবার কেহ বা ঘাট হইতে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে।

চীনদেশীয় এক বাজিকর নানা প্রকার অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

বাজিকর একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় সিংহলীকে ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তোমার মাথার মধ্যে ২৫৬টি পাথরের নুড়ি রহিয়াছে, বল তো বাহির করিয়া দিই।' অমনিই জনতা সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাহির কর, বাহির কর।' তখন বাজ্যিকর ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র চিমটা দিয়া তাহার কর্ণ হইতে সুপারীর মতো বড় বড় অসংখ্য পাথর বাহির করিয়া মাটিতে স্তূপীকৃত করিল। প্রৌঢ় সিংহলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ভারি হাসির একটা ধুম পড়িয়া গেল। একজন পরিহাস করিয়া বলিল, "শেঠ, তোমার মাথা যে এত নিরেট, তাহা জানিতাম না।'

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইল। সমুদ্রের গায়ে সীসার রং লাগিল। দিগন্তরেখার যে স্থানটায় সূর্য অস্ত গিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় দূর সমুদ্রবক্ষে সেই রক্তিমাভার সম্মুখে তিনটি কৃষ্ণবর্ণের ছায়া আবির্ভূত হইল। সকলে দেখিল, তিনখানি জাহাজ বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তখন, জাহাজ কোথা হইতে আসিয়াছে, কাহার জাহাজ-ইহা লইয়া ঘাটের দর্শকদিগের মধ্যে তর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবী জাহাজ, কেহ বলিল, চীনা; কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—কোন দেশীয় জাহাজ, নিশ্চয়রূপে কিছু বুঝা গেল না।

মির্জা দাউদ ঘাটে ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টি সেই জাহাজ তিনটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'পোর্তুগীজ জাহাজ! —কিন্তু ফিরিঙ্গী কোন পথে আসিল?''

তারপর গগনপ্রান্তে দিবা-দীপ্তি নিবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীর্ণ সিন্ধুবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র পোত ছিন্ন পাল নামাইয়া কালিকটের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

পরদিন প্রভাতে সূযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কয়েকজন বিদেশীকে ঘিরিয়া ভারি ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গীগণ অপরিচিত ভাষায় কি বলিতেছে, কেহই বুঝিতেছে না এবং প্রত্যুত্তরে নানা দেশীয় ভাষায় তাহাদের প্রশ্ন করিতেছে। মির্জা দাউদ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'এখানে পোর্তুগীজ ভাষা বুঝে, এমন কেহ কি নাই? আমি জামেরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই-দোভাষী খুঁজিতেছি।'

মির্জা দাউদ দেখিলেন, বক্তা শালপ্রাংশু বিশালদেহ এক পুরুষ। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণভি কেশ এবং হ্রস্ব সূচ্যগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। উর্ধ্বাঙ্গে সোনার জরির কাজ-করা অতি মূল্যবান মখমলের অঙ্গরক্ষা, কটি হইতে জানু পর্যন্ত ঐ মখমলের জঙিয়া এবং জানু হইতে নিম্নে পদদ্বয় চমনির্মিত খাপে আবৃত। মস্তকে টুপির উপর কঙ্কপত্র বক্রভাবে অবস্থিত; এই পুরুষের সহিত অন্য পাঁচ-ছয় জন যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও প্রায় অনুরূপ বেশধারী। সকলের কোটবন্ধে তরবারি।

মির্জা দাউদ এই প্রধান পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গভীরস্বরে কহিলেন, 'আমি পোর্তুগীজ ভাষা বুঝি।'

নবাগত কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে মির্জা দাউদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইল। সে ধীরে ধীরে কহিল, 'তুমি দেখিতেছি মুর!'

এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত যে সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা, তাহা মীর্জা দাউদকে বিদ্ধ করিল। তিনিও মনোগত বিদ্বেষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মূর। তোমরা দেখিতেছি পোর্তুগীজ—জলদস্যু; তোমাদের সহিত পরিচয় আমার প্রথম নহে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নাই।'

এতক্ষণে দ্বিতীয় একজন পোর্তুগীজ কথা কহিল। তাহার বয়স অল্প, উদ্ধতকণ্ঠে বলিল, 'মূর-কুকুরের সহিত আমরা সদ্ভাব রাখি না।—মুরের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম।'

নিমেষমধ্যে মির্জা দাউদের কটি হইতে ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরীক্ষণেই আগন্তুকদিগের প্রধান ব্যক্তি হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। বিনীতস্বরে কহিল, 'মহাশয়, আমার এই স্পর্ধিত সঙ্গীকে ক্ষমা করুন। আপনি মুর এবং আমরা পোর্তুগীজ বটে; কিন্তু আমরা উভয়েই ব্যবসায়ী, জলদস্যু নাহি। অন্যত্র যাহাই হোক, এখানে আমার সহিত আপনাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ আপনার হৃদ্যতা লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।' তারপর নিজ সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পেড্রো, আর কখনও যদি তোমার মুখে এরূপ কথা

শুনিতে পাই, তোমার প্রত্যেক অস্থি চাকায় ভাঙিয়া তারপর ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।'

ভয়ে পেড্রোর মুখ পীতবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে কম্পিত বিদ্রোহের কণ্ঠে কহিল, 'আমি সত্য কথা বলিতে ভয় করি না। মূরমাত্রেই আমাদের ঘৃণার পাত্র। আপনি নিজেও তো মূরকে—'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের মতো দুই হাত বাড়াইয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বজ্রমুষ্টিতে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া থাকিবার পর ছাড়িয়া দিতেই পেড্রো হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, 'মিথ্যাবাদীর দণ্ডদান ধার্মিকের কর্তব্য। এখন দয়া করিয়া আমার সহিত জামোরিনের নিকট গিয়া আমার নিবেদন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।''—বলিয়া মাথার টুপি খুলিয়া আভূমি লুণ্ঠিত করিয়া অভিবাদন করিল। দর্শকবৃন্দ—যাহারা পোর্তুগীজ ভাষা বুঝিল না, তাহারা অবাক হইয়া এই দুর্বোধ্য অভিনয় দেখিতে লাগিল।

মির্জা দাউদ আগন্তুকের মিষ্ট বাক্যে ভুলিলেন না, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, তুমি অতি ধূর্ত। কি জন্য সামরীর রাজ্যে আসিয়াছ, সত্য বল।'

'বাণিজ্য করিতে।'

'খ্রীস্টান, আমি তোমাদের চিনি। কলহ তোমাদের ব্যবসায়, লোভ তোমাদের ধর্ম, পরশ্রীকাতরতা তোমাদের স্বভাব। এ রাজ্যে কলহ-বিদ্বেষ নাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিব্রু নির্বিবাদে শান্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে। সত্য বল, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দে পদার্পণ করিয়াছ?'

ফিরিঙ্গীর মুখ রক্তহীন হইয়া গেল! শুধু তাহার চক্ষুযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো নিশ্বফল ক্রোধ ও হিংসা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; কিন্তু পরীক্ষণেই আপনাকে সংবরণ করিয়া সে কণ্ঠবিলম্বিত সুবর্ণ-ক্রুশি হস্তে তুলিয়া বলিল, ''এই ক্রুশ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি।–সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।''

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, ''তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। চল, সামরীর প্রাসাদে তোমাদের লইয়া যাই।''

তখন বিদেশীরা মির্জা দাউদের অনুসরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিল। পেড্রোর সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাটের পাথরের উপর মৃত্যুবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সামরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া পোর্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক বলিল, ''আমার নাম ভাস্কো-ডা-গামা—আমি পোর্তুগালের রাজদূত। আপনার নিকট কালিকটে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।'' এই বলিয়া পোর্তুগাল-রাজ-প্রেরিত মহার্ঘ উপঢৌকন সকল সামরীর সম্মুখে স্থাপন করিতে সঙ্গীগণকে ইঙ্গিত করিল।

মুখে যাহাই বলুন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস মির্জা দাউদের অন্তর হইতে দূর হইল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মূরমাত্রেই চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, ফিরিঙ্গী অতিশয় অর্থলিঙ্গু ও ভোগালুব্ধ। ইহাদের জন্মভূমি অর্থপ্রসূ নহে; তাই অন্নের জন্য ইহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় বটে, কিন্তু এই জন্যই ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র, নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে একবার ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্রনির্বিচারে সকলের উপর দুর্কিনীত বাহুবল, স্পর্ধর্ম ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ। স্বার্থরক্ষার জন্য এমন কাজ নাই যাহা ইহারা পারে না এবং স্বজাতির স্বার্থবির্ধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে ইহারা তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

পোর্তুগাল হইতে সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই, এ পথ। এতদিন অজ্ঞাত ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা সেই পথ ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বহু নৃতন সম্ভাবনা ও দুভাবনার সৃষ্টি করিল। সম্প্রতি ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ভাবে বুঝা যায় না। অথচ উদ্ধত ও কটুভাষী পেড্রোর কণ্ঠরোধ করিয়া সে যে একটা গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে মির্জা দাউদের বিলম্ব হইল না। শঙ্কা ও সংশয়ের মেঘে তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পোর্তুগীজগণ কালিকটে বাস করিতে লাগিল এবং দিন দিন নূতন পণ্যে তরণী পূর্ণ করিতে লাগিল। অতি অপদার্থ পণ্য দ্বিগুণ চতুগুণ মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিল। ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়ীরা যতই উৎফুল্ল হউন না কেন, মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদশী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উচিত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ নবাগতরা অব্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইল। কালিকটের জীবনপ্রবাহ পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল।

একদিন শরৎকালে মেঘমার্জিত আকাশে শুভ্র পাল উড়াইয়া দুইটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, বঙ্গদেশ হইতে প্রভাকর শ্রেষ্ঠীর নৌকা আসিতেছে। প্রভাকর শেঠ অতি প্রসিদ্ধ বণিক—প্রতি বৎসর এই সময় লক্ষাধিক মুদ্রার বস্ত্রাদি পণ্য বহন করিয়া তাহার তরণী কলিকটে উপস্থিত হয়। কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর চেলি, কৌশেয় পট্ট, বাংলার মলমল কিনিবার জন্য কলিকটে সওদাগর সমাজে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। এত সুন্দর এবং এত মূল্যবান বস্ত্র কেহই আনিতে পারে না, সেজন্য প্রভাকরের এত খ্যাতি।

প্রভাকরের নৌকা ঘাটে লাগিবীর পূর্বেই নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভাকর নৌকার উপর দাঁড়াইয়া পরিচিত সকলকে নমস্কার-সম্ভাষণাদি করিতে লাগিল। সে অতিশয় বাকপটু ও রহস্যপ্রিয়, এজন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হিব্রু মুশা ইব্রাহিম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘প্রভাকর, এবার তোমার দেরি দেখিয়া আমরা

ভাবিয়ছিলাম, বুঝি আর আসিলে না—পথে তোমাদের সুন্দরবনের কুমীর তোমাকে পেটে পুরিয়াছে।'

প্রভাকর হাসিয়া বলিল, "মুশা সাহেব, পেটে পুরিলেও কুমীর আমাকে হজম করিতে পারিত না!—এই যে মির্জা সাহেব! আদাব আদাব—শরীর-গতিক সব ভালো তো? এবার আপনার ফরমাশী জিনিস সমস্ত আনিয়াছি, কত লইতে পারেন দেখিব। আপনার কোমরে তলোয়ারখানি নূতন দেখিতেছি, ডামাস্কাসের বুঝি? আমার কিন্তু এক জোড়া চাই—গৌড়েশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত হইয়া আছি। ভালো কথা, পথে আসিতে শ্রীখণ্ডের নিকট আপনার যবদ্বীপ-যাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—খবর সব ভালো। —হায়দর মুস্তফা যে, ইতিমধ্যে কয়টি সাদি করিলেন? এবার কিন্তু ইস্পাহানী আঙ্গুরের রস না খাওয়াইলে বড়ই অন্যায় হইবে। —জাম্বো, শাঁখালুর মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিস না—দড়িটা ধর।"

নৌকা বাঁধা হইলে প্রভাকর ঘাটে নামিয়া সকলের সহিত আলিঙ্গনাদি করিল। তখন মিজা দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভাকর, কি কি সওদা আনিলে?"

প্রভাকর বলিল, 'এবার যে মলমল আনিয়াছি, মিজা সাহেব, তেমন মলমল আজ পর্যন্ত কখনও চোখে দেখেন নাই। মাকড়শার জালের চেয়েও নরম, কাশফুলের চেয়েও হালকা-মুঠির মধ্যে দেড়শ গজ কাপড় ধরা যায়। কিন্তু এক থান কাপড়ের দাম পাঁচ তোলা সোনা, তার কমে দিতে পারিব না। কোচিনে চার তোলা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল—আমি লই নাই! শেষে কি লোকসান দিয়া ঘরে ফিরিব। শেঠনী তাহা হইলে আমার মুখ দেখিবে না।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, "তা না দেখুক। তোমার মুখ না দেখিলেও শেঠনীর কোনও লোকসান হইবে না। —এখন তোমার সওদা দেখাও।"

প্রভাকর বলিল, "বলেন কি মিজা সাহেব, লোকসান হইবে না? শেঠনীর এখন যৌবনকাল, কাঁচা বয়স; এখন স্বামীর মুখদর্শন না করিলে জীবন-যৌবন সমস্তই লোকসান হইয়া যাইবে যে!—ভালো কথা, গতবারে শুনিয়াছিলাম, আপনার বিবি-সাহেবা নাকি অসুস্থ। তা কোনও শুভ সংবাদ আছে নাকি?"

মির্জা দাউদ বলিলেন, "খোদার দয়ায় একটি মেয়ে হইয়াছে।–"

প্রভাকর বলিল, "এত বড় আনন্দের সংবাদ এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! আমাদের দেশে বলে, মেয়ে হইলে পিতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ রাত্রে আপনার দৌলতখানায় আমার নিমন্ত্রণ রহিল। দেশে কুকুটাদি ভোজনের সুবিধা হয় না—দুপ্রাপ্যও বটে, আর ব্রাহ্মণগুলো বড়ই গণ্ডগোল করে। —ও বাবা! এটি আবার কে, মিজা সাহেব? এ রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তো কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে আসিল?"

মির্জা দাউদ ফিরিয়া দেখিলেন, ভাস্কো-ডা-গামা দুই জন সহচর সঙ্গে সেই দিকে আসিতেছে। ইতিমধ্যে কালিকটের পথে-ঘাটে দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন পক্ষেই সৌহাদ্য বর্ধনের আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরঞ্চ উভয়ে উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন।

প্রভাকরের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা দাউদ কহিলেন, "ইহারা পোর্তুগীজ। ক্রমে পরিচয় পাইবে।"

ইত্যবসরে প্রভাকরের নৌকা হইতে পণ্যসামগ্রী সকল পরিদর্শনের জন্য ঘাটে নামানো হইতেছিল। সওদাগরেরা ভিড় করিয়া তাহাঁই দেখিতেছিলেন। মির্জা দাউদও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্য দিক হইতে ভাস্কো-ডা-গামাও আসিয়া মিলিত হইল।

মলমলের নমুনা দেখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, “অতি উৎকৃষ্ট মলমল। প্রভাকর, এ জিনিস কত আনিয়াছ?”

প্রভাকর সগর্বে বলিল, “পুরা এক জাহাজ।”

দাউদ কহিলেন, “ভালো, আমি এক জাহাজই লইলাম। দর-দামের কথা আজ রাত্রে স্থির হইবে।”

ভাস্কো-ডা-গামা এরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম মলমল পূর্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুত, এত মহার্ঘ মলমল পারস্য দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও যাইত না। পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে যাহা যাইত, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল। ডা-গামার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিল। পোপ এবং রাজা ইমানুয়েলকে নজর দিতে হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? সে বলিল, “এ মলমল আমি কিনিব।”

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, “আর উপায় নাই। এই মলমল আমি কিনিয়াছি।”

ডা-গামা প্রভাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আমি অধিক মূল্য দিব।”

মির্জা দাউদ কহিলেন, “অধিক মূল্য দিলেও পাইবে না—এ মলমল এখন আমার।”

ডা-গামা সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।”

মির্জা দাউদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “শতগুণ দিলেও আর পাইবে না।”

ডা-গামা বিদ্যুদবেগে মির্জা দাউদের দিকে ফিরিল। কর্কশকণ্ঠে কহিল, “মূর, চুপ করু—আমি মালের মালিকের সহিত কথা কহিতেছি।”

প্রভাকর বুদ্ধিমান, মির্জা দাউদ তাহার পুরাতন খরিদার, অথচ এই ব্যক্তিকে সে চেনেও না। সে বলিল, ‘উনিই এখন মালের মালিক, আমি কেহ নই। উনি যদি আপনাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।’

ডা-গামার অশিষ্ট কথায় কিন্তু মির্জা দাউদের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, “ডা-গামা, পূর্বেও বুঝিয়ছিলাম, কিন্তু আজ তোর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। ব্যবসায় তোর ভান মাত্র, তুই তস্কর। নচেৎ অনুচিত মূল্য দিয়া বাণিজ্য নষ্ট করিবি কেন?”

আহত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিজ কটি হইতে তরবারি বাহির করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকষায়িত নেত্রে কহিল, ‘স্পর্ধিত মূর, আজ তোর রক্তে তরবারির কলঙ্ক ধৌত করিব।’
মির্জা দাউদও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, ‘বর্বর ফিরিঙ্গী, আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।’

মুহূর্তমধ্যে ব্যগ্র জনতা চতুর্দিকে সরিয়া গিয়া মধ্যে বৃত্তাকৃতি স্থান যুযুৎসুদের জন্য ছাড়িয়া দিল। শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও এরূপ ব্যাপার কালিকটে একান্ত বিরল নহে। কলহ যখন তরবারি পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন তাহা ভঞ্জন করিবার প্রয়াস যে শুধু নিশ্বফল নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রদ্বারা

উভয়পক্ষকে বিবাদের মীমাংসা করিবার সুবিধা করিয়া দিল।

ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদ প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়েই পরস্পরকে যে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ উভয়ের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্নিবার বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এ কলহ যে একজন না মরিলে নিবৃত্ত হইবে না, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিলেন।

নিস্তব্ধ জনতার কেন্দ্রস্থলে অসিধারী দুই জন দাঁড়াইলেন। ভাস্কো-ডা-গামা বিশালকায়, প্রস্তরের মতো কঠিন, হস্তীর মতো বলশালী। মির্জা দাউদ অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব; কিন্তু বিষধর কালসর্পের মতো ক্ষিপ্র, তেজস্বী ও প্রাণসার। ভাস্কো-ডা-গামার তরবারি বেত্রবৎ ঋজু, তীক্ষ্ণাগ্র; মির্জা দাউদের তরবারি ঈষৎ বক্র ও ক্ষুরধার। নগ্ন কৃপাণহস্তে ক্ষণকালের জন্য দুই জন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর ঝড়ের মতো তরবারিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা আক্রমণ করিল।

কিন্তু ডা-গামার তরবারি মির্জা দাউদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ তরবারি দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরীক্ষণেই তাঁহার বক্র অসি বিদ্যুতের মতো একবার ডা-গামার জানু দংশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডা-গামা পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার জানুর চর্মাবরণ ধীরে ধীরে রক্তে ভিজিয়া উঠিল।

ডা-গামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না; কিন্তু সাবধান হইল। সংযত ও সতর্কভাবে অসিচালনা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মির্জা দাউদের অসি-কৌশল অসাধারণ, তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার ভুল করিলে আর তাহা সংশোধনের অবকাশ থাকিবে না।

এদিকে মির্জা দাউদও বুঝিলেন যে, ডা-গামা অসি-কৌশলে তাঁহার সমতুল্য, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলশালী। আবার সে তাঁহার মতো ক্ষিপ্রগামী ও লঘুদেহ নয় বটে, কিন্তু তরবারি ঋজু এবং দীর্ঘ—মির্জা দাউদের তরবারি বক্র এবং খর্ব। তাঁহাদের যুদ্ধরীতিও সম্পূর্ণ পৃথক। এ ক্ষেত্রে, মির্জা দাউদ দেখিলেন, ডা-গামার জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। মির্জা দাউদ অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সর্প ও নকুলের যুদ্ধে যেমন উভয়ে উভয়ের চক্ষুতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র তীরবেগে আক্রমণ করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, ডা-গামা ও মির্জা দাউদও সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঝনৎকার উঠিতে লাগিল, চঞ্চল অসিফলকে সূর্যকিরণ পড়িয়া তড়িৎরেখার মতো জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্পন্দ জনর্বাহ সহস্রচক্ষু হইয়া এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বাক্যশূলে ডা-গামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 'ফিরিঙ্গী দাসুন্টু, চাহিয়া দেখ, তোর রক্ত মানুষের রক্তের মতো লাল নয়, শয়তানের মতো নীল! খ্রীস্টান কুত্তা, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর—তোর প্রাণ ভিক্ষা দিব।''

ডা-গামা কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্লেষ করিয়া মির্জা দাউদ যে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর ডা-গামা তাহা বুঝিয়েছিল।

যুদ্ধ ক্রমে আরও প্রখর ও তীব্র হইয়া উঠিল। দুই যোদ্ধারই ঘন ঘন শ্বাস বহিল। সবাঙ্গে ঘাম

ঝরিতে লাগিল; কিন্তু উভয়েই যেন এক অদৃশ্য বর্মে আচ্ছাদিত। ডা-গামার তরবারি বার বার মির্জা দাউদের কণ্ঠের নিকট হইতে, বক্ষের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, মির্জা দাউদের অসি ডা-গামাকে ঘিরিয়া এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও হুল ফুটাইতে পারিল না।

সহসা এক সময় ডা-গামা সভয়ে দেখিল যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক পা পিছাইলেই সমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইবে। মির্জা দাউদ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপ-বিষাক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ফিরিঙ্গী, আজ তোকে ঐ সমুদ্রের জলে চুবাইব। তারপর মরা ইদুরের মতো তোর রাজা ইম্যানুয়েলের কাছে তোকে বিকশিশ পাঠাইয়া দিব।"

এতক্ষণে মির্জা দাউদ যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই হইল-ভাস্কো-ডা-গামা ধৈর্য হরাইল। উন্মত্ত বন্যামহিষের মতো গর্জন করিয়া অসি উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সে মির্জা দাউদকে আক্রমণ করিল। ইচ্ছা করিলে মির্জা দাউদ অনায়াসে ডা-গামাকে বধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তরবারির উল্টা পিঠ দিয়া ডা-গামার দক্ষিণ মুষ্টিতে দারুণ আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরবারি হস্তমুক্ত হইয়া উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ অস্ত্রহীন হইয়া ডা-গামা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডা-গামার দুই জন সহচর। এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। প্রভুর অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, অতি বিশাল-কলেবর নিকষকৃষ্ণ হাবসী জাম্বো মাস্তুলের ন্যায় দুই হস্ত বাহির করিয়া তাহাদের কেশ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং নিরতিশয় শুভ্র দুইপাটি দন্ত বিনিক্রান্ত করিয়া যাহা বলিল, তাহার একটি বর্ণও তাহারা বুঝিতে না পারিলেও জাম্বোর মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না।

মির্জা দাউদ তরবারির ধার ডা-গামার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "ডা-গামা, নতজানু হ, নহিলে তোকে বধ করিব।"

ডা-গামা নতজানু হইল না—বাহুদ্বয়ে বক্ষ নিবদ্ধ করিয়া বিকৃতমুখে হাস্য করিয়া কহিল, "মূর, নিরস্ত্রকে হত্যা করা তোদের স্বভাব বটে।"

মির্জা দাউদ কিয়াৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ভালো, তোকে ছাড়িয়া দিব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্–'

ডা-গামা কহিল, "আমি কোনও প্রতিজ্ঞা করিব না, তোর যাহা ইচ্ছা কর।"

মির্জা দাউদ বলিলেন, "শপথ করা যে, আজ হইতে সপ্তাহমধ্যে সদলবলে এ দেশ ছাড়িয়া যাইবি, আর কখনও ফিরিবি না।"

ডা-গামা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "মূর, তুই অতি নির্বোধ! আমি শপথ করিব না, আমাকে বধ কর। আমার রক্তে কলিকটের মাটি ভিজিলে হিন্দে ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা সহজে রোপিত হইবে।"

মির্জা দাউদ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এতদিনে নিজ মুখে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্তি করিলি! কিন্তু তাহা হইতে দিব না। ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজ কালিকটে রোপিত হইবে না। কালিকট চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। প্রতিজ্ঞা কর, নচেৎ——

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, নচেৎ?

“নচেৎ পোর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে একটি প্রাণীও জীবিত রাখিব না। তোদের জাহাজ পুড়াইয়া এই একশত ত্রিশ জন লোককে কাটিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।”

ডা-গামা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোনও উত্তর দিল না।

মির্জা দাউদ পুনশ্চ কহিলেন, “ডা-গামা, এখনও শপথ করা—তোর ধর্মের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিব। —ভাবিয়া দেখ, তোরা মরিলে কে তোর দেশবাসী ভিক্ষুকদের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে?”

ডা-গামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “শপথ করিতেছি—”

মির্জা দাউদ কহিলেন, “তোদের যেশুর জননী মেরীর নামে শপথ কর।”

ডা-গামা তখন কম্পিত ক্রোধ-জর্জরিত কণ্ঠে শপথ করিল যে, সপ্তাহমধ্যে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও ভারতভুমির উপর পদার্পণ করিবে না।

ডা-গামাকে ছাড়িয়া দিয়া মির্জা দাউদ ও আরও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ সামরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া সামরী কহিলেন, “যত দিন উহারা আমার রাজ্যের কোনও প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিতেছে, ততদিন শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারি না। তবে কেহ যদি তোমাদের ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তোমরা প্রতিশোধ লইতে পার, আমি বাধা দিব না।”

সকলে সামরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত কূটবুদ্ধি ও যুদ্ধনিপুণ, তাহাদের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে; সুযোগ পাইলেই তাহারা বাহুবলে এই সোনার রাজ্য অপূর্ব অমরাবতী গ্রাস করিবে।

সামরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমার সৈন্যবল নাই সত্য, কিন্তু সামরীবংশ পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই মসলিন্দে রাজত্ব করিতেছে—কেহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে নাই। আমার সিংহাসন সুশাসন ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহারা আমার কি করিতে পারে?”

সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পরে স্বর্ণপত্রে লিখিত সামারীর সন্ধি লিপি মস্তকে ধারণা করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা অনুচরসহ জাহাজে উঠিল।

মির্জা দাউদ বন্দর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “ডা-গামা, শপথ স্মরণ রাখিও।”

একটা ক্রুর হাস্য ডা-গামার মুখের উপর খেলিয়া গেল, মির্জা দাউদের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, “মির্জা দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।”

মির্জা দাউদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, “সম্ভব নয়। আমি মুসলমান—বেহেস্তে যাইব।”

ডা-গামা দুই চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কহিল, “ইহজন্মেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।”

তারপর ধীরে ধীরে তাহার তিনটি জাহাজ বন্দরের বাহির হইয়া গেল।

০৪

চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি বৎসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই কাহিনীর অন্তর্গত না হইলেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট ত্যাগ করিবার দুই বৎসর পরে আবার পোর্তুগীজ জাহাজ ভারতবর্ষে আসিল। এবার পোর্তুগীজদের অধিনায়ক আলভারেজ কেবলার নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁহার অধীনে নয়খনি জাহাজ। পাদ্রী আলভারেজ কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিয়াই জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ফলে বহু নাগরিকের প্রাণনাশ হইল, অনেকে আহত হইল এবং কয়েকটি অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাজা-প্রজার মনে ভীতি ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া পোর্তুগীজরা আবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করিল। রাজা সামরী আগন্তুকদিগকে সম্মান দেখাইলেন ও তাহাদের বাসের জন্য নগরের বাহিরে ভূমিদান করিয়া কুঠি-নিমাণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজদিগের এই অহেতুক জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতায় কালিকটের জনসাধারণের মন তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারপর কলহ বাধিতে বিলম্ব হইল না। দাম্ভিক বিদেশীদের প্রতি যাহাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়ছিল, তাহারা ঝগড়া বাধাইয়া রক্তপাত করিতে লাগিল। পোর্তুগীজরাও জবাব দিল। ক্রমে ভিতরে বাহিরে আগুন জুলিয়া উঠিল। একদিন নাগরিকগণ পোর্তুগীজদের কুঠিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সত্তর জন্য ফিরিঙ্গীকে হত্যা করিল। অবশিষ্ট পলাইয়া জাহাজে উঠিল এবং হাজ হইতে গোলা মারিয়া নগরের এক অংশে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর সেই যে হারা কালিকট ছাড়িয়া গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিল না।

কালিকটের রাজা-প্রজা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—আপদ দূর হইয়াছে, আর ফিরিবে না।

শেষোক্ত ঘটনার বৎসরেক পরে মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা লইয়া তাঁহার জন্মভূমি মরক্কো দেশে গেলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কাশরীফ দর্শন করিলেন। তারপর তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।

কথা ছিল, মক্কাশরীফ হইতে মির্জা দাউদ কালিকটে আসিবেন, তাঁহার পিতা মরক্কো দেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু পিতা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অধিক দিন পরমায়ু নাই। পুনরায় মরক্কো যাইবার সুযোগ হয়তো শীঘ্র হইবে না, ততদিন পিতা বাঁচবেন কি না, এই সকল বিবেচনা করিয়া মির্জা দাউদ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, নিজের সঙ্গে কালিকাটে লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধও ঈদের চাঁদের মতো সুন্দর ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন——তিনিও বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

মক্কাশরীফ দর্শনের সময় কালিকাটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মির্জা দাউদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনারাও কালিকটে ফিরিতেছেন—আমার জাহাজেই চলুন।' তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সপরিবারে মির্জা দাউদের জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

মক্কা হইতে কালিকট তিন মাসের পথ। জাহাজ যথাসময়ে আরব উপকূল ছাড়িয়া লোহিত সাগর পার হইল। ক্রমে পারস্য উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

মহাসাগরের বুকের উপর বায়ু-বর্তুলিত পালের ভরে মির্জা দাউদের তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। চারিদিকে অতল জল দুলিতেছে, ফুলিতেছে—লক্ষকোটিখণ্ডে বিচূর্ণিত দর্পণের মতো রবিকরে প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ণ দিগন্তরেখা অখণ্ডভাবে তরুণীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেবল বহুদূরে পূর্বচক্রবালে মেঘের মতো কচ্ছভূমির তাঁটবনানী ঈষন্মাত্র দেখা যাইতেছে।

জাহাজে যে অভিজ্ঞ আড়কাঠি আছে, সে বলিয়াছে যে বায়ুর দিক এবং গতি পরিবর্তিত না হইলে অষ্টহমধ্যে কালিকটে পৌঁছানো যাইবে। আশু যাত্রাশেষ কল্পনা করিয়া আরোহীরা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন শুক্রবার, সূর্য ক্রমে মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। জাহাজের বিস্তৃত ছাদের উপর মির্জা দাউদ, তাঁহার পিতা ও আর আর পুরুষগণ দ্বিপ্রাহরিক নমাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন। জাহাদের নিয়ামক সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া হালের নিকট নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু তরণীর বেগবিদীর্ণ জলরাশি ফেন-হাস্যে কলকল করিতেছে।

এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে পাঁচখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য দাঁড় বাহিয়া যেন বহুপদবিশিষ্ট অতিকায় জলজন্তুর মতো ছুটিয়া আসিতেছে। অতর্কিতে এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের মানুষগুলাকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মতো সেই দিকে নিষ্পলকভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

বিস্মিত হইবার মতো দৃশ্য বটে! দুই দণ্ড পূর্বেও চতুর্দিকে কোথাও একটা ভেলা পর্যন্ত ছিল না। সহসা সমুদ্রের কোন অতল গুহা হইতে এই পাঁচটা ভীষণ দৈত্য বাহির হইয়া আসিল? মির্জা দাউদের মন বলিল, আজ আর রক্ষা নাই। কামান দাগিয়া ইহারা নিজ আগমনবাতর্গ ঘোষণা করিয়াছে—আজ তাহারা দয়ামায়া দেখাইবে না। মুরের রক্তে হিংসা চরিতার্থ করিবার আজ তাঁহাদের সুযোগ মিলিয়াছে।

এরূপ ঘটনা প্রতীচ্যখণ্ডের সমুদ্রবক্ষে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এইপথে শত শত তরণী অবাধে যাতায়াত করিয়াছে। চীন হইতে কাষ্পীয় হ্রদ পর্যন্ত কেহ। কখনও হিংস্রিক বা বোম্বেটের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ অধিক নিরাপদ ছিল বলিয়াই জলবাণিজ্য এত প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ যুগযুগান্তরের বাহিতপণ্য অব্যাহত পথে স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গী তাহার অগ্নি-অস্ত্র লইয়া পাথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যুদ্ধদান করা মির্জা দাউদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জাহাজ তীর্থযাত্রীর জাহাজ, তাহাতে বারুদ-গোলা কিছুই নাই। আছে কেবল কতকগুলি অসহায় যুদ্ধানভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী এবং তদপেক্ষাও অসহায় কতকগুলি নারী ও শিশু। এরূপ অবস্থায় পাঁচখানা রণপোতের

সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক উপায় পলায়ন; কিন্তু মির্জা দাউদের জাহাজ কেবল পালের ভরে চলে—বিপক্ষের পাল দাঁড় দুই আছে; এ ক্ষেত্রে পলায়নও সাধ্যাতীত।

মির্জা দাউদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চিন্তা করিলেন। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন। আকাশ নির্মেঘ–বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। রাত্রি হইতে বিলম্ব আছে। তিনি নাবিককে ডাকিয়া সমস্ত পাল তুলিয়া প্রাণপণে জাহাজ ছুটাইতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু এ আজ্ঞা পালিত হইতে না হইতে জলদস্যুদিগের পাঁচখানা জাহাজ হইতে একসঙ্গে কামান ডাকিল। একটা গোলা বড় পালের ভিতর ছিদ্র করিয়া জাহাজের পরপারে গিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল, অন্যগুলা জাহাজের চারিদিকে জলের উপর পড়িল। কোনটাই কিন্তু জাহাজকে গুরুতর জখম করিতে পারিল না।

জাহাজের পুরুষযাত্রীদের মুখ শুকাইল। নিম্ন হইতে ভীত শিশু ও নারীগণের আর্তস্বর ও ক্রন্দন উঠিল। দন্তে দন্ত চাপিয়া মির্জা দাউদ নাবিকদের হুকুম দিলেন, ‘‘যতক্ষণ পারি, জাহাজ চালাও, ফিরিঙ্গ দস্যুর হাতে ধরা দিব না।’

এমন সময় মির্জা দাউদের চারি বৎসরের কন্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বলিল, ‘‘বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।’’—বলিয়া পিতার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, ‘‘বাবা, আমার বড় ভয় করছে।’’

মির্জা দাউদ কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার কানে কানে বলিলেন, হরুণা, কাঁদিস না। তুই মুরের কন্যা—তোর কিসের ভয়? আজ আমরা সকলে একসঙ্গে বেহেস্তে যাইব।’’

কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে দিয়া মির্জা দাউদ নীচে নামিয়া গেলেন। সম্মুখেই আকুলনায়না স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নিজ কাটি হইতে ক্ষুদ্র মাণিক্যখচিত ছুরিকা পত্নীর হস্তে দিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, ‘‘শালেহা বোধ হয় আজ অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বেটে জাহাজ পিছু লইয়াছে। যদি উহারা এ জাহাজে পদার্পণ করে, এ ছুরি নিজের উপর ব্যবহার করিও। তার পূর্বে কিছু করিও না। আর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আশ্বাস দিও, অকারণে ভয় না পায়। চলিলাম।’’—এই বলিয়া মুহূর্তকালের জন্য পত্নীর মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মির্জা দাউদ উপরে ফিরিয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া দেখিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে দসুজাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এত নিকটে আসিয়া পডিয়াছে যে, তাহদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। মির্জা দাউদ দেখিলেন, প্রত্যেক জাহাজ হইতে কামানের মুখ তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। এত নিকট হইতে এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

মির্জা দাউদের পিতা আসিয়া বলিলেন, ‘‘দাউদ, আর উপায় নাই। ধরা না দিলে জাহাজ ডুবি হইয়া মরিতে হইবে।’’

মির্জা দাউদ কহিলেন, ‘ধরা দিলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহার অপেক্ষা ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।’

পিতা বলিলেন, ‘‘সে কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে শিশু ও স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তাহদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?’

মির্জা দাউদ কিয়াৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কিন্তু দসুযরা শিশু ও নারীদের দয়া করিবে: কি? বরঞ্চ—'

পিতা কহিলেন, "ফিরিঙ্গী অর্থলোভী, অর্থের বিনিময়ে তাহদের ছাড়িয়া দিতে পারে।"

অন্যান্য পুরুষগণও বৃদ্ধের বাক্য সমর্থন করিলেন। মির্জা দাউদ তখন কহিলেন, "ভালো, চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।"

ঠিক এই সময় একখানা জাহাজ হইতে আবার কামান দাগিল। এবার গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড মাস্তুল পালসুদ্ধ মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তুপীকৃত পালের কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেল।

রমণীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আবরু রক্ষা করিয়া জাহাজের খোলের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এবার আর লজ্জার বাধা মানিল না। সন্তানবতীরা সন্তান কোলে লইয়া, যাহাদের সন্তান নাই—তাহারা যে যেমনভাবে ছিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল। সকলেই ভয়বিহ্বলা। কেহ উর্ধর্বমুখী নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রাণের আকুল আবেদন জানাইতে লাগিল, কেহ। শিশু-সন্তানকে দুই হাতে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া জলদসুযাদিগকে দেখাইয়া তাহাদের কৃপা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে পালের আগুন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া জাহাজময় ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিল। পুরুষগণ তখন সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া অগ্নিনিবাপণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে অনেক জল ঢালিবার পর অগ্নি নির্বাপিত হইল। তখনকার মতো জাহাজ রক্ষা পাইল।

একখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ মির্জা দাউদের জাহাজের একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে মাত্র একশত গজের ব্যবধান। কামান ঘুরাইয়া তাহারা আবার গোলা ছুড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। তখন মির্জা দাউদ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'গোলা ছুড়িও না—আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

কামান ছাড়িয়া তাহারা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন—বোধ হয়, সেই প্রধান নাবিক-কহিল, "তোমাদের জাহাজে যত অস্ত্র আছে, জলে ফেলিয়া দাও—নহিলে কামান ছুঁড়িব।"

মির্জা দাউদ কহিলেন, "আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নাই। ইহা তীর্থযাত্রীর জাহাজ। যাহা কিছু ধনরত্ন সঙ্গে আছে, দিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া দাও।"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় আক্রমণকারী জাহাজের ভিতর হইতে একজন পুরুষ উপরে উঠিয়া আসিল। অতি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত বিশালদেহ এক পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মির্জা দাউদের বুকের রক্ত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। চিনিলেন—ভাস্কো-ডা-গামা। তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কাল-সর্পের মতো হিংসা যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে। মির্জা দাউদকে দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা হাসিল। মাথার কঙ্কপত্রযুক্ত টুপি খুলিয়া তাহা আভুমি সঞ্চারিত করিয়া বলিল, 'মির্জা দাউদ, আজ সুপ্রভাত! স্মরণ আছে, বলিয়াছিলাম আবার দেখা হইবে?'

মির্জা দাউদের মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। ভাস্কো-ডা-গামা তখন পূর্বোক্তি প্রধান নাবিকের দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কাপ্তেন, কামান নীরব কেন? আমার হুকুম কি ভুলিয়া গিয়াছ?'

ভীত কাপ্তেন বলিল, "প্রভু, উহারা ধনরত্ন দিয়া পরিত্রাণের আর্জি করিতেছে।"

দুই জাহাজ ক্রমে আরও নিকটবর্তী হইতেছিল। ডা-গামা আবার মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "মূর, ধনরত্ন দিয়া প্রাণভিক্ষা চাও?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, "নিজের প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমাদের সর্বস্ব লইয়া বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দাও।"

ডা-গামা শত্রুর লাঞ্ছনার রস অল্প অল্প করিয়া পান করিতে লাগিল, কহিল, "বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দিব? কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ? বরঞ্চ তোমরা যুবতী নারীদের আমাদের নিকট পঠাইয়া দিয়া পুরুষগণ প্রাণ বাঁচাইতে পার। আমাদের জাহাজে স্ত্রীলোকের কিছু প্রয়োজন হইয়াছে। আমার নিজের জন্য নয়–খালাসীদের জন্য। আমার নারীতে রুচি নাই।"

ক্রোধে অপমানে মির্জা দাউদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলেন, ডা-গামা তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিলেন, "ডা-গামা, তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা হইতেছে। যদি অভিরুচি হয়, আমাদের সহিত যাহা মূল্যবান সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তাহা লইয়া আমাদের নিষ্কৃতি দাও। নতুবা কিছুই পাইবে না।'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কিছুই পাইব না, তার অর্থ? মির্জা দাউদ কহিলেন, "তার অর্থ —জোর করিলে আমাদের মারিয়া ফেলিতে পরিবে, কিন্তু কিছু লাভ করিতে পরিবে না। যদি আমার জাহাজে চড়াও করিবার চেষ্টা কর, তক্তা খুলিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিব।"

মির্জা দাউদের কথা শুনিয়া ডা-গামার ভ্রূকুটি গভীরতর হইল, সে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে জাহাজের মাস্তুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মির্জা দাউদ পঙ্কে নিবদ্ধ হস্তীর মতো চলচ্ছক্তিহীন। ফিরিঙ্গীর পাঁচখানা জাহাজ ধীরে ধীরে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মির্জা দাউদ অধীর হইয়া কহিলেন, "ডা-গামা, যাহা করিবে, শীঘ্র করি। আমাদের সহিত বারশত তোলা সোনা আছে—আরও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু আছে; যদি পাইতে ইচ্ছা কর, শীঘ্র বল। অধিক বিলম্ব করিলে সব হারাইবে।"

ডা-গামা বলিল, "রমণীদের দিবে না?"

মির্জা দাউদ গর্জিয়া উঠিলেন, "না, দিব না। আমরা স্ত্রী-কন্যার ব্যবসা করি না।"

ডা-গামা কহিল, "মূর, এখনও তোর স্পধর্ণ কমিল না!—ভালো, অর্থই লাইব। তোমার জাহাজে যাহা কিছু আছে, ভেলায় করিয়া আমার জাহাজে পাঠাও।"

'যাহা কিছু আছে পাইলে ছাড়িয়া দিবে।'

'দিব।'

"তোমাকে বিশ্বাস কি?"

'আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

"মিথ্যাচারি, শপথ করিয়াছিলে কখনও হিন্দে পদার্পণ করিবে না, তাহার কি হইল?'

ডা-গামা হাসিয়া বলিল, ‘‘এখনও হিন্দে পদার্পণ করি নাই।’’

মির্জা দাউদ তখন অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই কহিলেন, উহাদের কবলে যখন পড়িয়াছি, তখন উহাদের কথায় বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। অগত্যা মির্জা দাউদ সম্মত হইলেন।

তখন এক ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, নারীগণের অলংকার পর্যন্ত তুলিয়া ডা-গামার জাহাজে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

ডা-গামা জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমাদের আর কিছু নাই?’

‘না।’

‘আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—নারীদের দিবে না?’

অসহ্য ক্রোধে মির্জা দাউদের বাকুরুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু তাঁহার চক্ষুদ্বয় অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালকূটের মতো হাসিল। বলিল, ‘‘ভালো, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।’’ তারপর কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, ‘‘কাপ্তেন, গোলা মারিয়া উহাদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দাও। আজ মুসলমান কুকুরগুলাকে পুড়াইয়া মারিব।’’

মির্জা দাউদ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘‘শঠ। বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী শয়তান!’’

ডা-গামা কহিল, ‘‘মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস। তোর স্ত্রীকে আমি বাদী করিয়া রাখিব!’

মির্জা দাউদ উন্মত্তের মতো গর্জন করিতে লাগিলেন, ‘‘শয়তান! শয়তান।’’

জাহাজে ভীষণ কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে পাগলের মতো চারিদিকে ছাটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই যেন এই অভিশপ্ত জাহাজ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আর্তরব উঠিল, ‘‘রক্ষা করো! দয়া করো! প্রাণ বাঁচাও!’’

এই আকুল প্রার্থনার জবাব আসিল। সহসা শিলাবৃষ্টির মতো জাহাজের উপর বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন ভীষণতর রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

মির্জা দাউদের পিতা ক্ষুদ্র হারুণাকে বক্ষে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্খলিত কণ্ঠে একবার শুধু ডাকিলেন, ‘দাউদ!’

দুর্দম আবেগে মির্জা দাউদ একসঙ্গে পিতা ও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এমন সময় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া শালেহা আসিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মির্জা দাউদ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার তিন জনের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, ‘পিতা, ঈশ্বর কি নাই?’

সহসা হারুণা ক্ষুদ্র একটি কাতরোক্তি করিয়া এলাইয়া পড়িল। দ্রুত কন্যাকে নিজের ক্রোড়ে

লইয়া মির্জা দাউদ দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই। নিষ্ঠুর গুলি তাহার বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে স্ত্রী ও পিতা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্য্যস্ত হইতেছে।

এইবার পাঁচখানা জাহাজ হইতে এককালে কামান ডাকিল। গোলার সংঘাতে শীতার্ত বৃদ্ধের মতো মির্জা দাউদের জাহাজখানা কাঁপিয়া উঠিল। পালের কামড়ে দপ করিয়া আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে জাহাজ নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আবার কামান গর্জিল। এবার জাহাজের সম্মুখ দিকটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কলকল শব্দে জল ঢুকিতে লাগিল।

তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আরোহীদের মিলিত কণ্ঠ হইতে এক মহা হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। জ্বলন্ত জাহাজ অকস্মাৎ জীবিতবৎ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল; তারপর সবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের উর্ধ্বোত্থিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী জাহাজগুলি চিত্রাপিতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায়ান্ধকারে তাহাদিগকে যেন অনা জগতের কোনও ভৌতিক তরণীর মতো দেখাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ হইতে দামামা ও তুর্য বাজিয়া উঠিল।

সূর্য তখন সমুদ্রপারে আস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।

শেষ

রুমাহরণ

০১.

চক্রায়ুধ ঈশানবর্মী নামক জনৈক নাগরিকের ঘৃণিত জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রব্যমা পাটলিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক প্রান্তে এক অর্ধশুস্ক কৃপমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কুপের মুখ ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহজাল দ্বারা আটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কূপের দুর্গন্ধ পঙ্কে আ-কটি নিমজ্জিত হইয়া, ভেক-সরীসৃপ-পরিবৃত হইয়া আমার অন্তিম তিন মাস কাটিয়াছিল।

জয়ন্তী নামী পুরীর এক দাসী চণ্ডালহস্তে শূকর মাংস আনিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমার জন্য কূপে ফেলিয়া দিয়া যাইত। এই জয়ন্তীর নিকট আমি রাজ-অবরোধের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। জয়ন্তী সোমদত্তার সহচরী কিঙ্করী ছিল; সে সোমদত্তার মনের অনেক কথা জানিত, অনেক কথা অনুমান করিয়াছিল। সে কুপমুখে বসিয়া সোমদত্তার কাহিনী বলিত, আমি নিমে অন্ধকারে কীটদংশনবিক্ষত অর্ধগলিত দেহে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতাম।

একদিন জয়ন্তীকে বলিয়াছিলাম, জয়ন্তী, আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার বহু গুপ্তধন মাটিতে প্রোথিত আছে, যদি মুক্তি পাই, তোমাকে দশ হাজার স্বর্ণদীনার দিব। তোমাকে আর চেটী বৃত্তি করিতে হইবে না।

ভীতা জয়ন্তী আমাকে গালি দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আর আসে নাই। অনন্তর চণ্ডাল একাকী আসিয়া মাংস দিয়া যাইত।

আমি একাকী এই জীবন্ত নরকে বসিয়া থাকিতাম। আর ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহা বলিবোর এ স্থান নহে। তবে সোমদত্তা আমার চিন্তার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। ভাবিতাম, সোমদত্তার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে আমার নিকট আত্মসমপণ করিল কেন? যদি চন্দ্রগুপ্তকে এত ভালোবাসিত, তবে সে বিশ্বাসঘাতিনী না হইয়া আত্মঘাতিনী হইল না

কেন? রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে বলিবে? তখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই।

কিন্তু আজ বহু জীবনের পরপারে বসিয়া মনে হয়, যেন সোমদত্তার চরিত্র কিছু কিছু বুঝিয়াছি। সোমদত্তা গুপ্তচর রূপে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল। কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে সংকল্প করিয়াছিল, চন্দ্রবর্মাকে দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়া পরে স্বামীর জন্য পাটলিপুত্র ভিক্ষণ মাগিয়া লইবে; কুমারদেবীর প্রভাব অস্তমিত হইবে, চন্দ্রগুপ্ত সত্যই রাজা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সোমদত্তাও স্বামীসোহিগিনী হইয়া পট্টমহিষীর আসন গ্রহণ করিবে।

আমার দুরন্ত লালসা যখন তাহার গোপন সংকল্পের উপর খড়্গের মতো পড়িয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইল সহজেই অনুমেয়। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিণী হীন গুপ্তচর বলিয়া কোন রমণী ধরা পড়িতে চাহে? সোমদত্তা দেখিল, ধরা পড়িলে স্বামীর অতুল ভালোবাসা সে হারাইবে; সে যে চন্দ্রগুপ্তকেই রাজ্য ফিরিয়া দিবার মানসে চক্রান্ত করিয়াছে, এ কথা চন্দ্রগুপ্ত বুঝিবে না, নীচ বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এদিকে চক্রায়ুধের হস্তেও নিস্তার নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ধর্মনাশ নিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় অসহায়া জালাবদ্ধ কুরঙ্গিণী কি করিবে?

অপরিমেয় ভালোবাসার যুপে সোমদত্তা সতীধর্ম বিসর্জন দিল। ভাবিল, আমার তো চরম সর্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই মর্মভেদী লেজার কাহিনী স্বামীকে জানিতে দিব না। এখন আমার যাহা হয় হউক, তারপর যে জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া নিজেও নরকে যাইব। কিন্তু স্বামীকে কিছু জানিতে দিব না।

ইহাই সোমদত্তার আত্মবিসর্জনের অন্তরতম ইতিহাস।

কিন্তু আর না, সোমদত্তার কথা এইখানেই শেষ করিব। এই নারীর কথা স্মরণে ষোল শত বৎসর পরে আজও আমার মন মাতাল হইয়া উঠে। জানি, সোমদত্তার মতো নারীকে বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করেন না— সে দেবভোগ্যা। জন্মজন্মান্তরের ইতিহাস খুঁজিয়া এমন একটিও নারী দেখিতে পাই নাই, যাহার সহিত সোমদত্তার তুলনা করিব। আর কখনও এমন দেখিব কি না জানি না।

আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্তার সহিত যদি আবার আমার সাক্ষাৎ হয়, জানি, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব। নূতন দেহের ছদ্মবেশ তাহাকে আমার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে পরিবে না।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে চিনিতে পরিবে? ললাটে কি স্মৃতির ভ্রূকুটি দেখা দিবে? অধরে সেই অন্তিমকালের অপরিসীম। ঘৃণা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে? জানি না! জানি না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। আপনি তাহার মুখের পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন না। মনে করেন, পূর্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। এই পূর্বে যে কোথায় এবং কত দিন আগে, আপনি তাহা জানেন না; আমি জানি। ভগবান আমাকে এই অদ্ভুত শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমরা মনের অন্ধকার চিত্রশালায় চিত্রের ছায়াবাজি আরম্ভ হইয়া যায়। যে কাহিনীর কোনও সাক্ষী নাই, সেই কাহিনীর পুনরাভিনয় চলিতে থাকে। আমি তখন আর এই ক্ষুদ্র আমি থাকি না, মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মতো ভাসিয়া চলি। সে যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল জানি না, কত দিন ধরিয়া চলিবে তাহাও

ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকায় প্রচ্ছন্ন। তবে ইহা জানি যে, এই যাত্রা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত। মাঝে মাঝে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে যতি পড়িয়াছে মাত্র— সমাপ্তির সম কখনও পড়িবে কি না। এবং পড়িলেও কবে পড়িবে, তাহা বোধ করি বিধাতারও অজ্ঞেয়।

মহেঞ্জোদাড়োর নগর ও মিশরের পিরামিড যখন মানুষের কল্পনায় আসে নাই, তখনও আমি জীবিত ছিলাম। এই আধুনিক সভ্যতা কয় দিনের? মানুষ লোহা ব্যবহার করিতে শিখিল কবে? কে শিখাইল? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরশুমুণ্ড পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাইতেছেন না। আমি বলিতে পারি, কবে লোহার অস্ত্র ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সন-তারিখ দিয়া বলিতে পারিব না। সন-তারিখ তখনও তৈয়ার হয় নাই। তখন আমরা কাঁচা মাংস খাইতাম।

চারিদিকে পাহাড়ের গণ্ডি দিয়া ঘেরা একটি দেশ, মাঝখানে গোলাকৃতি সুবৃহৎ উপত্যকা। যক্তিবাড়িতে কাঠের পরাতের উপর ময়দা স্তুপীকৃত করিয়া ঘি ঢালিবার সময় তাহার মাঝখানে যেমন নামাল করিয়া দেয়, আমাদের পর্বতবলয়িত উপত্যকাটি ছিল তাহারই একটি সুবিরাট সংস্করণ। আবার বিধাতা মাঝে মাঝে আকাশ হইতে প্রচুর ঘৃতও ঢালিয়া দিতেন; তখন ঘোলাটে রাঙা জলে উপত্যকা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত। পাহাড়ের অঙ্গ বহিয়া শত নির্ঝরিণী সগর্জনে নামিয়া আসিয়া সেই হ্রদ পুষ্ট করিত। আবার বর্ষাপগমে জল শুকাইত, কতক গিরির্যন্ত্র পথে বাহির হইয়া যাইত; তখন অগভীর জলের কিনারায় একপ্রকার দীর্ঘ ঘাস জন্মিত। ঘাসের শীর্ষে ছোট ছোট দানা ফলিয়া ক্রমে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিত। এই গুচ্ছ গুচ্ছ দানা কতক ঝরিয়া জলে পড়িত, কতক উত্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হংস আসিয়া খাইত। সে সময় জলের উপরিভাগ অসংখ্য পক্ষীতে শ্বেতবর্ণ ধারণা করিত এবং তাহাদের কলধ্বনিতে দিবা-রাত্রি সমভাবে নিনাদিত হইতে থাকিত। শীতের সময় উচ্চ পাহাড়গুলার শিখরে শিখরে তুলার মতো তুষারপাত হইত। আমরা তখন মৃগ, বানর, ভল্লকের চর্ম গাত্রাবরণ রূপে পরিধান করিতাম। গিরিকন্দরে তুষার-শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া অস্থি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিত। পাহাড়ে শুষ্ক তরুর ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অগ্নি তৈয়ার করিতে তখনও শিখি নাই। অগ্নিকে বড় ভয় করিতাম।

আমাদের এই উপত্যকা কোথায়, ভারতের পূর্বে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস করিতাম; পর্বতচক্রের বাহিরে কখনও যাই নাই, সেখানে কি আছে তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ এই গিরিচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পাহাড়ে বানর, ভল্লক, ছাগ, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু বাস করিত, আমরা তাঁহাই মারিয়া খাইতাম; ময়ুরজাতীয় এক প্রকার পক্ষী পাওয়া যাইত, তাহার মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু ছিল। তাহার পুচ্ছ দিয়া আমাদের নারীরা শিরোভূষণ করিত। গাছের ফলমূলও কিছু কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহা যৎসামান্য; পশুমাংসই ছিল আমাদের প্রধান আহার্য।

চেহারাও আহারের অনুরূপ ছিল। মাথায় ও মুখে বড় বড় জটাকৃতি চুল, রোমশ কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশি। এরূপ আকৃতির মানুষ আজকালও মাঝে মাঝে দু-একটা চোখে পড়ে, কিন্তু জাম-কাপড়ের আড়ালে স্বরূপ সহসা ধরা পড়ে না। তখন আমাদের জামা-কাপড়ের বালাই ছিল না, প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম। তাহাও গ্রীষ্মকালে বর্জন করিতাম, সামান্য একটু কটিবাস থাকিত।

আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী— তাম্রবণা, কৃশাঙ্গী, ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী

শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে প্রস্তরফলকাগ্র বিষা পঞ্চাশহস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ক লোহিত ফলের কণাভরণ দুলাইয়া মৃদুগুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত। আমরা প্রস্তরপিণ্ডের অন্তরালে লুকাইয়া নিস্পন্দবক্ষে শুনিতাম–বুকের মধ্যে নামহীন আকাঙক্ষা জাগিয়া উঠিত!

এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র শ্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল…

কিন্তু গোড়া হইতে আরম্ভ করাই ভালো। কি করিয়া এই অর্ধপশু জীবনের স্মৃতি জাগরকে হইল, পূর্বে তাঁহাই বলিব।

০২.

পূজার ছুটিতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রেলের চাকরিতে আর কোনও সুখ না থাক, ঐটুকু আছে— বিনা খরচে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া আসা যায়। আমি হিমালয়ের কোন দিকে গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। — তবে সেটা দার্জিলিং কিংবা সিমলা পাহাড় নহে। যেখানে গিয়াছিলাম। সে স্থান আরও নির্জন ও দুরধিগম্য; রেলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দশ-বারো মাইল রিকশা কিংবা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া উত্ত্যক্ত পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবি না; সচরাচর আশ্বিনমাসে পাহাড়ের অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু নহে। গিরিক্রোড়ের এই ক্ষুদ্র জনবিরল শহরটি এমনভাবে তৈয়ারি যে, মানুষের হাতের কাজ খুব কমই চোখে পড়ে। যে পথটি সর্পিল গতিতে কখনও উচু কখনও নিচু হইয়া শহরটিকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাইন গাছের শ্রেণীর দ্বারা তাহা এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহার শীর্ণ দেহটি সহসা চোখেই পড়ে না। ছোট। ছোট পাথরের বাড়িগুলি পাহাড়ের অঙ্গে মিশিয়া আছে। মাঝে মাঝে পাইনের জঙ্গল, তাহার মধ্যে পাথরের টুকরা বসাইয়া মানুষের বিশ্রামের স্থান করা আছে। রাত্রিকালে ক্কচিৎ ফেউয়ের ডাক শুনা যায়। শীত চমৎকার উপভোগ্য।

সেদিন পাইন গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়ছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাঁহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এ দেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী

শিকারীর চেহারা,—হাতে একটা ধনুক কিংবা বশ্য থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।

এখানে আসিয়া অবধি কোনও বাঙালীর মুখ দেখি নাই, অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হয় নাই, তাই একাকী ঘুরিতেছিলাম। বাহিরের শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি আমাকে গভীর রাত্রিতে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্ধ ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

এ বন রাত্রিকালে খুব নিরাপদ নহে জানিতাম, ফেউয়ের ডাকও স্বকর্ণে শুনিয়াছি; কিন্তু তবু এক অদৃশ্য মায়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার পর একটি গাছের ছায়ায় পাথরের বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে মৃদু। বাতাসে গাছের পাতা অল্প নড়িতেছে; দু-একটা ফল বৃন্তচুযত হইয়া টুপটাপ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া জগতে আর শব্দ নাই।

আমি ভিন্ন এ-বনে আরও কেহ আছে। বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার যে ছক পাতা রহিয়াছে তাহার উপর একটি নিঃশব্দে সঞ্চরমাণ শুভ্রমূর্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। মূর্তি কখনও তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল, কখনও অবাস্তব কল্পনার মতো চন্দ্রলোক-কুহেলি ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে একটি ক্ষীণ তন্দ্রামধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিতে লাগিল,—ঐ ছায়ামূর্তি গান করিতেছে। গানের কথাগুলি ধরা গেল না, কিন্তু সুরটি পরিচিত, যেন পূর্বে কোথায় শুনিয়াছি। ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মতো সুর, কিন্তু প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী চির-পরিচয়ের আনন্দে ঝংকৃত করিয়া তুলে।

গান ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এই গান যতই কাছে আসিতে লাগিল, আমার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলেও এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। সে অবস্থা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নাই। সে কি তীব্র অনুভূতি! আনন্দের কোন উদ্দামতম অবস্থায় মানুষের শরীরে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে জানি না, কিন্তু মনে হইল, দেহের স্নায়ুগুলা এবার অসহ্য হর্ষবেগে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইবে।–যে গান গাহিতেছিল, সে নারী এবং যে ভাষায় গান গাহিতেছিল তাহা বাংলা; কিন্তু সে জন্য নহে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্য কারণ ছিল। এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি— বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাত এই যে, যে-ভাষায় এ গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলাভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই! কোথায় অন্তরের কোন নির্জন কন্দরে এতকাল। লুকাইয়া ছিল, শুনিবা মাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল। গানের কথাগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া অসংযুক্ত ছড়ার মতো প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একদিন উহারই ছন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিত। গানের কথাগুলি এইরূপ :

বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী
ধারালো তীর হেনে!
চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে
পারবো গায়ে আমি।
আমার চুলে বিনিয়ে দেব, ওরে,
স্বামী আমার– নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

গায়িকা আরও কাছে আসিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোমাঞ্চিত।–দেহে প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলাম। ওঃ, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল! আমার প্রিয়া—আমার সঙ্গিনী— আমার রুমা! এত দিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম?

যে তরুচ্ছায়ার নিম্নে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে গাহিতে গাহিতে ঠিক সেই ছায়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, চাঁদের দিকে চোখ তুলিয়া গাহিল,—

স্বামী আমার,–নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া আর আমার হৃদয় ধৈর্য মানিল না। আমি বাঘের মতো লাফাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু সহসা কিছুই বলিতে পারিলাম না। যে ভাষায় কথা বলিতে চাই, সে ভাষার একটা শব্দও স্মরণ নাই। অবশেষে অতি কষ্টে যেন অর্ধজ্ঞাত বিদেশী ভাষায় কথা কহিতেছি, এমনই ভাবে বাংলায় বলিলাম, তুমি রুমা— আমার রুমা!

তাহার গান থামিয়া গিয়াছিল, সে ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, কে? কে?

তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, আমি আমি! রুমা চিনতে পারছ না?

সভয় ব্যাকুল-কণ্ঠে সে বলিল, না। কে তুমি? তোমাকে আমি চিনি না। হাত ছেড়ে দাও!

জলবিম্ব যেমন তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিয়া যায়, তেমনই এক মুহূর্তে আমার মোহ-বুদ্বুদ ভাঙিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া লজ্জিত অপ্রতিভভাবে বলিলাম, মাপ করুন। আমার ভুল হয়েছিল।

রুমা চিত্রপিতার মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার পানে চাহিলাম! এই আমার সেই রুমা! পরিধানে সাদা শালের শাড়ি, আর একটি ত্রিকোণ শুভ্র শাল স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর বুচ দিয়া আটা, পায়ে সাদা চামড়ার জুতা। মস্তক অনাবৃত, কালো কেশের রাশি কুণ্ডলিত আকারে গ্রীবামূলে লুটাইতেছে। মুখখানি কুমুদের মতো ধবধবে সাদা, বয়স বোধ করি আঠারো-উনিশের বেশি নহে–একটি তরুণী রূপসী শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে!

কিন্তু না, এ আমার সেই রুমা! যাহাকে আমি তাহার স্বজাতির ভিতর হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলাম, যে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এ সেই রুমা! আজি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে আমার কাছে আসিল? আমাকে সে চিনিতে পারিল না?

আমার গলার পেশীগুলি সংকুচিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল। আমি রুদ্ধস্বরে আবার বলিয়া উঠিলাম, রুমা, চিনতে পারছি না?

রুমা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মোহাবিষ্ট স্বরে কহিল, আমার নাম রমা।

না—না—না, তুমি রুমা! আমার রুমা! মনে নেই, গুহার মধ্যে আমরা থাকতুম, ওপরে পাহাড়, নীচে উপত্যকী? তুমি গান গাইতে— যে গান এখনই গাইছিলে, সেই গান গাইতে, মনে নেই?

রুমার দুই চক্ষু আরও তন্দ্রাতুর হইয়া আসিল। ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, বলিল, মনে পড়ে না —কবে—কোথায়…

মাথার টুপিটি অধীরভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আমি ব্যগ্রস্বরে কহিতে লাগিলাম, মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসেছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হ্রদের জলে যে লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে। ভেড়ার লোম থেকে কাপড় বোনবার কৌশল যে আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলুম! মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম! তোমার দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলাম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এইখানে মারলে?

কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টি তাকাইয়া ছিল। আমার মনে ছিল না যে, কপালের ঠিক ঐ স্থানটিতেই আমার একটা রক্তবর্ণ জড়ুল আছে। কপালে হাত পড়িতেই স্মরণ হইল, নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। বহু পূর্ব্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্জ্জেয় বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলারুপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গাক্কা! গাক্কা?

গাক্কা! হাঁ, ঐ বিকট শব্দটাই তখন আমার নাম ছিল। বজ্রকঠিন বন্ধনে তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইলাম, বলিলাম, হ্যাঁ, গাক্কা—তোমার গাক্কা। চিনতে পেরেছ, রুমা! ওঃ, আমার জন্মজন্মান্তরের রুমা!

কতক্ষণ। এইভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। এক সময় সযত্নে তাহার মুখখানি বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলাম,–রুমা মূর্ছা গিয়াছে।

০৩.

তিত্তিকে লইয়া হুড়ার সহিত আমার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিত্তিকে আমি ভালোবাসিতাম না, তাহাকে দেখিলে আমার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছিল আমাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা যুবতী—সুন্দরী-কুলের রানী। আর আমি ছিলাম যুবকদের মধ্যে প্রধান, আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তিত্তিকে যে আমি গ্রহণ করিব এ বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না— আমারও ছিল না।

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্য যুবতী ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ডাইনী বুড়ি রিকখা তাহার গুহার সম্মুখের উচু পাথরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত দিন গান করিত—

আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মারবে–এ জাত মারবে! হে পাহাড়ের দেবতা, বিষরি স্রোতে যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মারবে! মেয়ে নেই— মেয়ে নেই!...

রিকখার দন্তহীন মুখের স্বলিত কথাগুলি গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী দৈববাণীর মতো বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সঙ্গিনীর জন্য সকলে পরস্পর লড়াই করিত বটে, কিন্তু তিত্তির দেহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। দূর হইতে লোলুপ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সকলে সরিয়া যাইত। তিক্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ–ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও ছিল অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরুবেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্যু করিতে করিতে তাহার অজিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। বৃক্ষগুলোর অন্তরাল হইতে অদৃশ্য চক্ষু তাহার নিরাবরণ দেহ বিদ্ধ করিত। কিন্তু তিত্তি দেখিয়াও দেখিত না— শুধু নিজ মনে অল্প অল্প হাসিত। সে ছিল কুহকময়ী চিরন্তনী নারী।

আমার মন ছিল শিকারের দিকে, তাই আমি তিত্তির চপলতা ও স্বৈরাচার গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ক্রমে আমারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার কারণ হুড়া। হুড়া ছিল আমারই মতো একজন যুবক, কিন্তু সে অন্যান্য যুবকদের মতো আমাকে ভয় করিত না। সে অত্যন্ত হিংস্র ও ক্রুরপ্রকৃতির ছিল, তাই শক্তিতে আমার সমকক্ষ না হইলেও আমি তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিয়া চালিতাম। সেও আমাকে ঘাঁটাইত না, যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তিত্তিকে লইয়া সে এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, আমার অহংকারে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে নিঃসংকোচ তিত্তির পাশে গিয়া বসিত, তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, চুল ধরিয়া টানিত, তাহার কান হইতে পাকা বন্দরী ফলের অবতংস দাঁত দিয়া খুলিয়া খাইয়া ফেলিত। তিত্তিও হাসিত, মারিত, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু সত্যিকার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হুড়াকে নিরুৎসাহ করিত না।

এইরূপে হুড়ার সহিত আমার লড়াই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন প্রকাণ্ড একটা বরাহের পিছনে পিছনে বহু ঊর্ধ্বে পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে তীরন্ধনুক ছিল। কিন্তু বরাহটাকে মারিতে পারিলাম না। সোজা যাইতে যাইতে সহসা সে একটা বিবরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময়

চোখে পড়িল, নীচে কিছুদূরে একটি সমতল পাথরের উপর দুটি মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। স্থানটি এমনই সুরক্ষিত যে, উপর হইতে ছাড়া অন্য কোন দিক হইতে দেখা যায় না। মানুষ দুটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। ইহারা কে, চিনিতে বিলম্ব হইল না— তিত্তি এবং হুড়া! তিত্তির মাথা হুড়ার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, হুড়ার একটা হাত তিত্তির কোমর জড়াইয়া আছে। দুইজনে মৃদুকণ্ঠে হাসিতেছে ও গল্প করিতেছে।

আমি সাবধানে পিঠ হইতে হরিণের শিঙের তীরটি বাছিয়া লইলাম। এটি আমার সবচেয়ে ভালো তীর, আগাগোড়া হরিণের শিং দিয়া তৈয়ারি, যেমন ধারালো তেমনই ঋজু। এ তীরের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ তিত্তি ও হুড়াকে এক তীরে গাঁথিয়া ফেলিব।

ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছি, এমন সময় তিত্তি মুখ ফিরাইয়া উপর দিকে চাহিল। পরীক্ষণেই অস্ফুট। চিৎকার করিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইল। হুড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বাহির করিল; গর্জন করিয়া কহিল, গাক্কা, তুই চলে যা, আমার কাছে আসিস না। আমি তোকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

আমি ধনুঃশর ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম, হুড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্বিতভাবে বলিলাম, হুড়া, তুই পালিয়ে যা! আর যদি কখনও তিক্তির গায়ে হাত দিবি, তোর হাত-পা মুচড়ে ভেঙে পাহাড়ের ডগা থেকে ফেলে দেব। পাহাড়ের ফাঁকে মরে পড়ে থাকবি, শকুনি তোর পচা মাংস ছিড়ে খাবে।

হুড়ার চোখ দুটা রক্তবর্ণ হইয়া ঘুরিতে লাগিল, সে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল, গাক্কা, তিত্তি আমার! সে তোকে চায় না, আমাকে চায়। তুই যদি তার দিকে তাকাস, তোর চোখ উপড়ে নেব। কেন এখানে এসেছিস, চলে যা! তিত্তি আমার, তিত্তি আমার! —বলিয়া ক্রোধান্ধ হুড়া নিজের বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, তুই তিত্তিকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিস; যদি পরিস কেড়ে নে;-— আয়, লড়াই কর!

হুড়া দ্বিতীয় আহ্বানের অপেক্ষা করিল না, বন্য শূকরের মতো আমাকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই চত্বরের ন্যায় সমতল ভূমির উপর ঘোর যুদ্ধ বাধিল। দুইটি ভালুক সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গেলে যেভাবে যুদ্ধ করে, আমরাও সেইভাবে যুদ্ধ করিলম। সেই আদিম যুদ্ধ, যখন নখ-দন্ত ভিন্ন অন্য অস্ত্র প্রয়োজন হইত না। হুড়া কামড়াইয়া আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, সবঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শক্তিতে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে নিস্তেজ করিয়া আনিলাম। তারপর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চিড়িয়া বসিলাম।

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়াছিল। দুই হাতে সেটা তুলিয়া লইয়া হুড়ার মাথা গুড়া করিয়া দিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিয়াছি, হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া রাক্ষসীর মতো তিত্তি আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। দুই হাতের আঙুল আমার চোখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রখর দন্তে আমার একটা কান কামড়াইয়া ধরিল।

বিস্ময়ে, যন্ত্রণায় আমি হুড়াকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিত্তি কিন্তু গিরগিটির মতো আমার পিঠ আঁকড়াইয়া রহিল। চোখ ছাড়িয়া দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কান ছাড়িল না। ওদিকে হুড়াও ছাড়া পাইয়া সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল। দুইজনের মধ্যে পড়িয়া আমার

অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তিত্তিকে পিঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত-পা দিয়া সে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। তাহার উপর কান কামড়াইয়া আছে, ছাড়ে না। এদিকে হুড়া আমার পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডটা তুলিয়া লইয়া আমারই মস্তক চুর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার আর সহ্য হইল না, রণে ভঙ্গ দিলাম।

অসমতল পাহাড়ের উপর একটা উলঙ্গ উন্মত্ত ডাকিনীকে পিঠে লইয়া দৌড়ানো সহজ কথা নহে। কিন্তু কিছুদূর গিয়া সে আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমার কর্ণ ত্যাগ করিয়া পিঠ হইতে পিছলাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি আর ফিরিয়া তাকাইলাম না। পিছনে তিত্তি চিৎকার করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।—

গাক্কা ভীতু, গাক্কা কাপুরুষ। গাক্কা মরদ নয়! সে কোন সাহসে তিত্তিকে পেতে চায়? তিত্তি হুড়ার বৌ! হুড়া তিত্তিকে গাক্কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, তিত্তির ভয়ে গাক্কা পালিয়েছে। গাক্কা ভীতু! গাক্কাকে দেখে সবাই হাসবে। গাক্কা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে না। গাক্কা কাপুরুষ! গাক্কা মরদ নয়?-তিত্তির এই তীব্র শ্লেষ রক্তাক্ত কর্ণে শুনিতে শুনিতে আমি উর্ধর্বশ্বাসে পলাইলাম।

০৪.

সেই দিন, সূর্য যখন উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িল, তখন আমি চুপি চুপি নিজের গুহা হইতে পাথরের ফলকযুক্ত বশটি লইয়া গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিলম। তিক্তিকে হারাইয়া আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু গ্রামের সকলে, যাহারা এত কাল আমাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপহাস করিবে, তিত্তি করতালি দিয়া হাসিবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা গোষ্ঠী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। উপত্যকার পরপারে ঐ যেখানে সূর্য ঢাকা পড়িল, ওখানে একটি ছোট গুহা আছে, একদিন শিকার করিতে গিয়া উহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। গুহার পাশ দিয়া একটি সরু ঝরনা নামিয়াছে, তাহার জল চাকভাঙা মধুর মতো মিষ্ট। ওদিকে। শিকারও বেশি পাওয়া যায়। এদিক হইতে তাড়া খাইয়া প্রায় সকল জন্তুই ওদিকে গিয়া জমা হয়, সুতরাং ঐখানে গিয়া বাস করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, বুড়ি ডাইনী রিকখা তাহার চাতালে বসিয়া গাহিতেছে—

মেয়ে নেই! মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। এ জাত বাঁচবে না। হে পাহাড়ের দেবতা, মেয়ে পাঠাও...

উপত্যকা পার হইয়া ওদিকের পাহাড়ে পৌঁছিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই নিটোল আকার ধারণ করিবে। এখন শরৎকাল, আকাশে মেঘ সাদা ও হালকা হইয়াছে, আর বৃষ্টি পড়ে না। উপত্যকার মাঝখানে হ্রদ,—ঠিক মাঝখানে নহে, একটু পশ্চিম দিক ঘেষিয়া, —তাহার। কিনারায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। ঘাসের আগায় শীষ গজাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। আর কিছু দিন পরে ঐ শীষ পীতবর্ণ হইলে উত্তর হইতে পাখিরা আসিতে আরম্ভ করিবে।

হ্রদের ধারা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, হরিণের দল জল পান করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো চকচক করিয়া উঠিল। ক্রমে যেখানে আমার ক্ষীণা ঝরনাটি হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম। এদিকে হ্রদের জল প্রায় পাহাড়ের কোল পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ হাতের বেশি নহে। সম্মুখেই পাহাড়ের জঙ্ঘার একটা খাঁজের মধ্যে আমার গুহা। আমি ঝরনার পাশ দিয়া উঠিয়া যখন আমার নূতন গৃহের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চাঁদের অপরিপুষ্ট চক্রটি গুহার পিছনে উচ্চ পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইল।

নূতন গৃহে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আমি একাকী মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত দেখা হয় না— হরিণের অন্বেষণেও এদিকে কেহ আসে না। তাহার প্রধান কারণ, পাহাড়-দেবতার করোল মুখের এত কাছে কেহ আসিতে সাহস করে না। আমাদের জাতির মধ্যে এই চক্রাকৃতি পর্বতশ্রেণী একটি অতিকায় অজগর বলিয়া পরিচিত ছিল, এই অজগরই আমাদের পর্বত-দেবতা। পর্বত-দেবতার মুখ ছিল দংষ্ট্রাবহুল অন্ধকার একটা গহ্বর। বস্তুত, দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, যেন শঙ্কাবৃত বিশাল একটা সরীসৃপ কুণ্ডলিত হইয়া তাহার ব্যাদিত মুখটা মাটির উপর রাখিয়া শুইয়া আছে। প্রাণান্তেও কেহ এই গহ্বরমুখের কাছে আসিত না।

গ্রীষ্মের অবসানে যখন আকাশে মেঘ আসিয়া গর্জন করিত, তখন আমাদের পাহাড়-দেবতাও গর্জন করিতেন। উপত্যকা জলে ভরিয়া উঠিলে তৃষ্ণার্ত দেবতা ঐ মুখ দিয়া জল শুষিয়া লাইতেন। আমাদের গোষ্ঠী হইতে বিষা-ঋতুর প্রাক্কালে দেবতার প্রীত্যর্থে জীবন্ত জীবজন্তু উৎসর্গ করা হইত। দেবতার মুখের নিকটে কেহ যাইতে সাহসী হইত না–দূর হইতে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জন্তুগুলা ছাড়িয়া দিত। জন্তুগুলাও দেবতার ক্ষুধিত নিশ্বাসের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মুখে প্রবেশ করিত। দেবতা শ্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করিতেন।

দেবতার এই ভোজনরহস্য কেবল আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, জন্তুগুলা কিছুকাল পরে দেবতার মুখ হইতে অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। পর্বত-দেবতার মুখ যে প্রকৃতপক্ষে একটা বড় গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়েছিলাম, তাই তাহার নিকট যাইতে আমার ভয় করিত না। একবার কৌতুহলী হইয়া উহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইলেও উহার ভিতরটা অত্যন্ত অন্ধকার, এজন্য বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু রন্ধ যে বহুদূর বিস্তৃত, তাহা বুঝিতে পারিয়ছিলাম।

এই পাহাড়-দেবতার মুখ আমার গুহা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে উত্তরে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এ-প্রান্তে দেবতার ভয়ে কেহ আসে না, অথচ এদিকে শিকারের যত সুবিধা, অন্য দিকে তত নহে। রাত্রিতে ঝরনা ও হৃদয়ের মোহনায় লুকাইয়া থাকিলে যত ইচ্ছা শিকার পাওয়া যায়— শিকারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। আমার গুহাটি এমনই চমৎকার যে, অত্যন্ত কাছে আসিলেও ইহাকে গুহা বলিয়া চেনা যায় না। গুহার মুখটি ছোট— লতাপাতা দিয়া ঢাকা; কিন্তু ভিতরটি বেশ সুপ্রসর। ছাদ উচু— দাঁড়াইলে মাথা

ঠেকে না; মেঝেটি একটি আস্ত সমতল পাথর দিয়া তৈয়ারি। তাহার উপর লম্বাভাবে শুইয়া রন্ধ্রপথে মুখ বাড়াইলে সমস্ত উপতাকাটি চোখের নীচে বিছাইয়া পড়ে। শীতের সময় একটা পাথর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুহামুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণও এই উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়।

এইখানে নিঃসঙ্গ শান্তিতে আমার কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আবার ক্ষীণ হইতে হইতে একদিন মিলাইয়া গেল। হ্রদের কিনারায় লম্বা ঘাসের শস্য পাকিয়া রং ধরিতে আরম্ভ করিল। পাখির ঝাঁক একে একে আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতে লাগিল; তাহাদের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি আমার নিশীথ নিদ্রাকে মধুর করিয়া তুলিল।

০৫.

একদিন অপরাহ্ণে, আমার গুহার পাশে ঝরনা যেখানে পাহাড়ের এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে লাফাইয়া পড়িয়াছে, সেই পৈঠার উপর বসিয়া আমি একটা নূতন ধনুক নির্মাণ করিতেছিলাম। দুই দিন আগে একটা হরিণ মারিয়াছিলাম, তাহারই অন্ত্রে ধনুকের ছিলা করিব বলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ে একপ্রকার মোটা বেত জন্মায়, তাহাতে খুব ভালো ধনুক হয়, সেই বেত একটা ভাঙিয়া আনিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত আমার বর্শীর ধারালো পাথরের ফলা দিয়া তাহারই দুই দিকে গুণ লগাইবার খাঁজ কাটিতেছিলাম। অস্তমান সূর্যের আলো আমার ঝরনার জলে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছিল; নীচে হ্রদের জলে পাখিগুলি ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝরনার চুর্ণ জলকণা নীচের ধাপ হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া অত্যন্ত মিঠাভাবে আমার অনাবৃত অঙ্গে লাগিতেছিল। মুখ নত করিয়া আমি আপন মনে ধনুকে গুণ-সংযোগে নিযুক্ত ছিলাম।

হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব চিহি-চিহি শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।

আগন্তুকগণ বহু নিম্নে উপত্যকায় ছিল, অতদূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আমি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া ঝরনার তীর হইতে আমার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম। গুহার মধ্যে লুকাইয়া দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া নবাগতদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

মানুষ হইলেও ইহারা যে আমার সগোত্র নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাহিরের কোনও অজ্ঞাত জগৎ হইতে রঞ্জপথে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও

অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলম। কিন্তু যেখান হইতেই আসুক, এমন আশ্চর্য চেহারা ও বেশভূষা যে হইতে পারে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। জন্তুদের কথা পরে বলিব, প্রথমে মানুষগুলার কথা বলি। এই মানুষগুলার গায়ের রং আমাদের মতো মধুপিঙ্গল বর্ণ নহে— ধবধবে সাদা। ইহাদের চুল সূর্য্যস্তের বর্ণচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ অতিশয় দীর্ঘ ও সুগঠিত। পশুচার্মের পরিবর্তে ইহাদের দেহ একপ্রকার শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহারা সংখ্যায় সর্বসুদ্ধ প্রায় একশত জন ছিল, তাহার মধ্যে অর্ধেক নারী। নারীগণও পুরুষদের মতো উজ্জ্বল কেশযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি। তাহারা বস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের হাতে ধনুবাণ ও ভল্ল আছে, ভল্লের ফলা সূর্যের আলোয় ঝকমক করিতেছে। বর্শার ফলা এমন ঝকমক করিতে পূর্বে কখনও দেখি নাই।

ইহাদের সঙ্গে তিন প্রকার জন্তু রহিয়াছে। প্রথমত, একপ্রকার বিশাল অথচ শীর্ণকায় জন্তু— তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ দেহ আশ্চর্যভাবে ঢেউখেলানো; দেহের সন্ধিগুলা যেন অত্যন্ত অযত্ন সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে, মুখ কদাকার। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। ইহাদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার দ্রব্য চাপানো রহিয়াছে। উদ্‌গ্রীবিভাবে গলা বাড়াইয়া ইহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় জন্তু ইহাদের অপেক্ষা অনেক ছোট, তাহদের দেহ রোমশ ও রক্তবর্ণ, আঁটসাঁট মজবুত গঠন। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু বহু মনুষ্য-শিশুও ইহাদের পিঠের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। এই জন্তুগুলাই গুহামুখ হইতে হৃদ দেখিয়া অদ্ভুত শব্দ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে কতকটা পাহাড়ী ছাগের মতো, কিন্তু ইহাদের দেহ ঘন রোমে আবৃত। এমন কি, ইহাদের রোম পেটের নীচে পর্যন্ত বুলিয়া পড়িয়াছে। ইহারা একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চলিয়াছে ও মাঝে মাঝেঃ ব্যা-ব্যা শব্দ করিতেছে।

এই সকল জন্তুর আচরণে সবাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ইহারা মানুষ দেখিয়া তিলমাত্র ভয় পাইতেছে না, বরং মানুষের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। মানুষ ও বন্যপশুর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে এই প্রথম দেখিলাম।

আগন্তুকের দল গুহাবিবর হইতে বাহির হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষগুলা হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল ও উত্তেজিতভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিল। তাঁহাদের কথা। এতদূর হইতে শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহারা এই উপত্যকার সন্ধান পাইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহাদের মধ্যে একজন হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারস্বরে একটা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতেছিল, শুধু তাঁহাই ক্ষীণভাবে কানে আসিল— বিহি, বিহি? বোধ হইল যেন হ্রদের ধারে লম্বা ঘাসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথাটা বলিতেছে।

ইহারা স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া কিছুক্ষণ কি জল্পনা করিল, তারপর সদলবলে আমার ঝরনার মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহারা এই স্থানেই ডোরাডাণ্ডা গাড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দিবাশেষের নির্বাপিতপ্রায় আলোকে ইহারা ঠিক আমার গুহার নিম্নে–ঝরনার জল যেখানে পাহাড় হইতে নামিয়া স্বচ্ছ অগভীর স্রোতে উপত্যকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া হ্রদের জলে মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পশুগুলির পৃষ্ঠ হইতে ভার নামাইল। ভারমুক্ত পশুগুলি ঝরনার প্রবাহের পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্তভাবে জল পান করিতে লাগিল।

ইহারা আমার এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এই প্রদোষালোকেও আমি প্রত্যেকের মুখ

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। আমার গুহা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বোধ করি তাহাদের মাথায় ফেলিতে পারিতাম। তাহাদের কথাবার্তাও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু একবর্ণও বোধগম্য হইতেছিল না।

রাত্রি হইল। তখন ইহারা এক আশ্চর্য ব্যাপার করিল! একখণ্ড পাথরের সহিত আর একখণ্ড অজ্ঞাত পদার্থ ঠোকাঠুকি করিয়া স্তূপীকৃত শুষ্ক কষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নি জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে সেই অঙ্গারে মাংস পুড়াইয়া সকলে আহার করিতে লাগিল। দগ্ধ মাংসের একপ্রকার অপূর্ব গন্ধ আমার নাসারান্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জিহ্বাকে লালায়িত করিয়া তুলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ইহারা পশুগুলির দ্বারা অগ্নির চারিপাশে একটি বৃহৎ চক্রবূহ, রচনা করিল, তারপর সেই চক্রের ভিতর অগ্নির পাশে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল একজন লোক ধনুবাণ হাতে লইয়া বাহের বাহিরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ইহারা ঘুমাইল বটে, কিন্তু বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। এই বিচিত্র জাতির অতি বিস্ময়কর আচার-ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তাহদের ক্রমশ নিবাণোন্মুখ অগ্নির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আগন্তুকরা কাজে লাগিয়া গেল। ইহারা অসাধারণ উদ্যমী; একদল পুরুষ উপত্যকার উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের টুকরা গড়াইয়া আনিয়া প্রাচীর-নিমাণে প্রবৃত্ত হইল, আর একদল ধনুবাণ-হস্তে শিকারের অন্বেষণে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অবশিষ্ট অল্পবয়স্ক বালকগণ পশুগুলোকে লইয়া উপতাকার শস্পাচ্ছাদিত অংশে চরাইতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরাও অলসভাবে বসিয়া রহিল না, তাহারা হদের জলে নামিয়া লম্বা ঘাসের পাকা শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। এইরূপে মৌমাছি-পরিপূর্ণ মধুচক্রের মতো এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ম-প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে চক্রাকৃতি প্রস্তর-প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রাচীর কোমর পর্যন্ত উচু হইল। কেবল হ্রদের দিকে দুই হস্ত-পরিমিত স্থান নির্গমনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় শিকারীরা একটা বড় হরিণ ও দুটা শূকর মারিয়া বশদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া আসিল। তখন সকলে আনন্দ-কোলাহল সহকারে অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস দগ্ধ

আর একটা অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করিলম। নারীগণ একপ্রকার বর্তুলাকৃতি পাত্র কক্ষে লইয়া ঝরনার তীরে আসিতেছে এবং সেই পাত্রে জল ভরিয়া পুনশ্চ কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা কেহই ঝরনায় মুখ ডুবাইয়া কিংবা অঞ্জলি করিয়া জল পান করে না, প্রয়োজন হইলে সেই পাত্র হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আর একটা রাত্রি কাটিয়া গেল, নবাগতগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই উপত্যকটি তাহাদের বড়ই পছন্দ হইয়াছে, সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আশু অভিপ্রায় তাহাদের নাই। আর একটা মনুষ্য জাতি যে সন্নিকটেই বাস করিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই; এবং সেই জাতির এক পলাতক যুবা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া অহরহ তাহদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহা সন্দেহ করিবারও কোনও উপলক্ষ হয় নাই। দিনের বেলা আলো থাকিতে আমি কদাচ গুহা হইতে বাহির হইতাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। বরাহদন্তের মতো বাঁকা চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিল।

ইহাদের মধ্যে যে-সব রমণী ছিল, তাহারা সকলেই সমর্থ; বৃদ্ধ বা অকর্মণ্যা কেহ ছিল না। নারীগণ অধিকাংশই সন্তানবতী এবং কোনও-না-কোনও পুরুষের বশবর্তিনী; কিন্তু কয়েকটি আসন্নযৌবনা কিশোরী কুমারীও ছিল। ইহাদের ভিতর হইতে একটি কিশোরী প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই কিশোরীর নাম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম,–রুমা। রুমা বলিয়া ডাকিলেই সে সাড়া দিত। রুমার রূপ কেমন ছিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না। যে-চোখে দেখিলে নিরপেক্ষ রূপবিচার সম্ভব হয়, আমি তাহাকে সে-চোখে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম যৌবনের চক্ষু দিয়া—লোভের চক্ষু দিয়া। আমার কাছে সে ছিল আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মতো সুন্দর। তিত্তি তাহার পায়ের নখের কাছে লাগিত না।

এই রুমার চরিত্র অন্যান্য বালিকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিল। কৈশোরের গন্ডি অতিক্রম করিয়া সে প্রায় যৌবনের প্রান্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তাই তাহার চরিত্রে উভয় অবস্থার বিচিত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে যথারীতি কাজ করিত বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই লুকাইয়া খেলা করিয়া লইত। তাহার সঙ্গিনী বা সখী কেহ ছিল না, সে একাকী খেলা করিতে ভালোবাসিত। কখনও হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে বহুদূর চলিয়া যাইত। তাহাকে আসিতে দেখিয়া জলে ভাসমান পাখিগুলি উড়িয়া আর একস্থানে গিয়া বসিত। সে জলে ডুব দিয়া একেবারে তাহাদের মধ্যে গিয়া মাথা তুলিত, তখন পাখিরা ভয়সূচক শব্দ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

কিন্তু এ খেলাও তাহার মনঃপূত হইত না। কারণ, তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বালক-বালিকারা জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিত। সে তখন জল হইতে উঠিয়া সিক্ত কেশজাল হইতে জলবিন্দু মোচন করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিত।

কখনও একটু অবসর পাইলে সে চুপি চুপি কোনও পুরুষের পরিত্যক্ত ধনুবাণ লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যাইত। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইতাম না, তারপর আবার সে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত। দেখিতাম, চুলে বনফুলের গুচ্ছ পরিয়াছে কর্ণে পক্ক ফলের দুল দুলাইয়াছে, কটিতে পুষ্পিত লতা জড়াইয়া দেহের অপূর্ব প্রসাধন করিয়াছে। ভীরু হরিণীর মতো এদিক-ওদিক চাহিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিত, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ত্রস্ত চকিত পদে প্রস্থান কিরিত। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সকলের অজ্ঞাতে একাকিনী কোনও কাজ করিতে পারিলেই সে খুশি হয়। ইহা যে তাহার বয়ঃসন্ধির একটা স্বভাবধর্ম, তাহা তখনও বুঝি নাই। কিন্তু আমার ব্যগ্র লোলুপ চক্ষু সর্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিত। এমন কি, রাত্রিকালে প্রস্তরবাহের মধ্যে ঠিক কোন স্থানটিতে সে শয়ন করিয়া ঘুমায়, তাহা পর্যন্ত আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই!

পাখিরা যেমন খড়কুটা দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ার করে, উহারাও তেমন গাছের ডালপালা দিয়া ব্যূহের মধ্যে একপ্রকার কোটর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয় অধিক শীতের সময় উহার মধ্যে রাত্রিবাস করিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সেগুলির নির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই, তাই উপস্থিত মুক্ত আকাশের তলেই শয়ন করিতেছিল।

ইহাদের আগমনের পঞ্চম দিনই বিশেষ স্মরণীয় দিন। র মনের মধ্যে যে অভিসন্ধি কয়েকদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইদিন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যে তাহা এমন অচিন্তনীয়ভাবে ফলবান হইয়া উঠিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? আগন্তুকদের নির্ভয় অসন্দিগ্ধচিত্তে কোনও অমঙ্গলের ছায়াপাত পর্যন্ত হয় নাই। এ রাজ্যে যে অন্য মানুষ আছে, এ সন্দেহই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা সকলে নানা কার্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। এক দল শিকারে বাহির হইয়াছিল, আর এক দল কাষ্ঠ আহরণের জন্য পর্বতস্পৃষ্ঠস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকেরা পশুগুলিকে চরাইতে গিয়াছিল। নারীগণ শিশু কোলে লইয়া অর্ধ-নির্মিত দারু কোটরের ছায়া বিশ্রাম করিতেছিল। হ্রদয়ের জলে সূর্যকিরণ পড়িয়া চতুর্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল ও জল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উত্থিত হইতেছিল।

আমি অভ্যাসমত গুহামুখে শিয়ান হইয়া ভাবিতেছিলাম, রুমাকে যদি হাতের কাছে পাই, তাহা হইলে চুরি করি। রাত্রিতে যে-সময় উহারা ঘুমায়, সে-সময় যদি চুরি করিয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালো হইত। কিন্তু একটা লোক সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়, তাহার উপর আবার আগুন জ্বলে। লোকটাকে তীর মারিয়া নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতে পারি—কেহ জানিবে না; কিন্তু আগুনের আলোয় চুরি করিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাইব। তার চেয়ে রুমাকে কোনও সময়ে যদি একেলা পাই,- সন্ধ্যার সময় নির্জনে যদি আমার গুহার কাছে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করি। এ গুহা ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া এমন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি যে, তাহার জাতি-গোষ্ঠীর কেহ আমাদের খুজিয়া পাইবে না।

সূর্যতাপে গুহার বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণাবোধ করিতে লাগিলাম। পাশেই নিঝরিণী, গুহা হইতে বাহির হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেই শীতল জল পাওয়া যায়; কিন্তু গুহার বাহিরে যাইলে পাছে নিম্নস্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে ইতস্তত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বাহির হইলাম। উঠিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব, দাঁড়াইলেই এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমি সন্তর্পণে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝরনার দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া দ্রুত নিজের কোটরে ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম।

ঝরনার ধার দিয়া দিয়া রুমা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহামুখের লতাপাতার আড়ালে থাকিয়া আমি স্পন্দিতবক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সে ধাপে ধাপে লাফাইয়া যেখানে ঝরনার জল প্রপাতের মতো নীচে পড়িয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার গুহার পাশেই ঝরনার জল প্রপাতের মতো নীচে পড়িয়াছে। যেখানে এই প্রপাত সবেগে উচ্ছলিত হইয়া পতিত হইয়াছে, সেইখানে পাথরের মাঝখানে একটি গোলাকার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাতিগভীর গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া স্বচ্ছ জল আবার নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রুমা এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সতর্কভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে বর্তুলাকৃতি জলপাত্রটি নামাইয়া রাখিল, তারপর ধীরে ধীরে দেহের বস্ত্র উন্মোচন করিতে লাগিল।

অসন্দিগ্ধচিত্তা হরিণীর পানে অদূরবর্তী চিতাবাঘ যেরূপ লোলুপ ক্ষুধিতভাবে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যকিরণে তাহার শুভ্র যৌবনকঠিন দেহ হইতে যেন লাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সে অলসভাবে দুই বাহু তুলিয়া তাহার সোমলতার মতো উজ্জ্বল কেশজাল জড়াইতে লাগিল। তারপর শূকরদন্তের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ঝকঝকে অস্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্রের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া চুলের মধ্যে গুজিয়া দিল।

এইরূপে কুণ্ডলিত কুন্তলভার সংবরণ করিয়া রুমা শিলাপট্টের উপর হইতে ঝুকিয়া বোধ করি জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর হর্ষসূচক একটি শব্দ করিয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

দুর্নিবার কৌতুহল ও লোভের বশবর্তী হইয়া আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই গুহা হইতে বাহির

হইয়া আসিলাম। ইহারা যেদিন প্রথম আসে সেদিন আমি যে শিলপৈঠার উপর বসিয়া ধনুকে গুণ সংযোগ করিতেছিলাম, গিরগিটির মতো গুড়ি মারিয়া সেই পৈঠার উপর উপস্থিত হইলাম। ইহার দশ হাত নীচেই জলের কুণ্ড। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম রুমা আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজের ভাষায় গুনগুনা করিয়া গান করিতেছে। স্বচ্ছ নির্মল জলের ভিতর হইতে তাহার দেহখানি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শীকরকণাস্পপৃষ্ট চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত মুখটি প্রস্ফুট জলপুষ্পের মতো দেখাইতেছে।

নির্নিমেষ-নিয়নে এই নিভৃত স্নানরতার পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, বলিতে পারি না। অগ্নিগর্ভ মেঘ আমার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতে লাগিল।

ক্রীড়াচ্ছলে দুই হাতে জল ছিটাইতে ছিটাইতে হঠাৎ এক সময় রুমা চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গান ও হস্তসঞ্চালন একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। আমার বুভুক্ষু ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার বিস্ফারিত ভীত চক্ষু কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিল। তারপর অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে জল হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

এই সুযোগ! আমি আর দ্বিধা না করিয়া উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলাম। রুমা তখনও জল হইতে উঠিতে পারে নাই, জল-কন্যার মতো তাহার সিক্ত শীতল দেহ আমি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম।

কিন্তু সিক্ত পিচ্ছিলতার জন্যই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে তাহার দেহটিকে সংসর্পিত বিভঙ্গিত করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে তীরে উঠিয়া এক হস্তে ভূপতিত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া পশ্চাদিকে একটা ভয়চকিত দৃষ্টি হানিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ব্যর্থ-মনোরথে নিজের গুহায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, নিলে ভীষণ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। অসংবৃতবস্ত্রা রুমা নারীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছে এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপরদিকে দেখাইতেছে। নারীগণ সমস্বরে কলরব করিতেছে। ইতিমধ্যে একদল পুরুষ ফিরিয়া আসিল। তাহারা রুমার বিবৃতি শুনিয়া তীর-ধনুক ও বল্লম হস্তে দলবদ্ধভাবে আমার গুহার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই স্থানে থাকা আর নিরাপদ নাহে দেখিয়া আমি গুহা ছাডিয়া পলায়ন করিলম। গাছপালার আড়ালে লুকাইয়া, পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরিয়া বহুদূর দক্ষিণে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর এতদূর পর্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করিবে না বুঝিয়া এক ঝোপের মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইখানে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে উদয় হইল। তীব্র-বিদ্ধের মতো আমি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।—একথা এতদিন মনে হয় নাই কেন? শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে আবার চলিতে আরম্ভ করিলম।

আমাদের গ্রামের কিনারায় আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন গোধূলি আগতপ্রায়। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, ডাইনী বুড়ি রিকখা গাহিতেছে—

রাত্রে পাহাড়-দেবতার মুখে আগুন জ্বলে। কেউ দেখে না, শুধু আমি দেখি। দেবতা কি চায়? মানুষ চায়— মানুষের তাজা রক্ত চায়! এ জাত বাঁচবে না, এ জাত মারবে! দেবতা রক্ত চায় — জোয়ানের তাজা রক্ত! কে রক্ত দেবে— কে দেবতাকে খুশি করবে! এ জাত মরবে— মেয়ে নেই! এ জাত মরবে— দেবতা রক্ত চায়! হে দেবতা, খুশি হও, তোমার মুখের আগুন

নিবিয়ে দাও! মেয়ে পাঠাও, মেয়ে পাঠাও!...

রিকখার গুহা গ্রামের এক প্রান্তে। চুপি চুপি পিছন হইতে গিয়া তাহার কানের কাছে বলিলাম, রিকখা, দেবতা তোর কথা শুনেছে— মেয়ে পাঠিয়েছে?

রিকখা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল, গাক্কা! তুই ফিরে এলি? ভেবেছিলাম, দেবতা তোকে নিয়েছে — কি বললি— আমার কথা দেবতা শুনেছে?

হ্যাঁ, শুনেছে। দেবতা অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে। ... শোন্ রিক্‌খা, গাঁয়ের ছেলেদের গিয়ে বল যে, পাহাড়-দেবতার মুখ থেকে একপাল মানুষ বেরিয়েছে–তাদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে। রাত্রে উপত্যকার ওধারে যেখানে আগুন জ্বলে, সেইখানে ওরা থাকে। মেয়েদের চেহারা ঠিক ঐ চাঁদের মতো,— নীল তাদের চোখ, চুলে আলো ঠিকরে পড়ে। আমি দেখেছি; তুই ছেলেদের বল, যদি বৌ চায় আমার সঙ্গে আসুক। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের গাঁয়ে যত জোয়ান আছে, সবাইকে ডাক। আজ রাত্তিরেই আমরা পুরুষগুলোকে মেরে ফেলে মেয়েদের কেড়ে নেব!

০৬.

আকাশে খণ্ডচন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই শত জোয়ান অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিঃশব্দে আগন্তুকদের গৃহপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীরের মধ্যে সকলে সুপ্ত— কোথাও শব্দ নাই। ধুনির আগুন জ্বলিয়া সূক্ষ্ম ভস্ম-আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহারই অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, ছায়ামূর্তির মতো চারিজন প্রহরী সশস্ত্রভাবে প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম, আজ দ্বিপ্রহরে আমাকে দেখিবার পর ইহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। আমরা চারিজন তীরন্দাজ এক একটি প্রহরীকে বাছিয়া লইলাম। একসঙ্গে চারিটি ধনুকে টংকারধ্বনি হইল— অন্ধকারে চারিটি তীর ছুটিয়া গেল। আমার তীর প্রহরীর কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে ফুড়িয়া বাহির হইল। নিঃশব্দে প্রহরী ভূপতিত হইল।

তারপর বিকট কোলাহল করিয়া সকলে প্রাচীর আক্রমণ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতা সহসা শতধা ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি জানিতাম ব্যূহের কোন দিকে রুমা শয়ন করে। আমি সেই দিকে গিয়া প্রাচীর উল্লঙঘন করিয়া দেখিলাম, ভিতরে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া ব্যূহ-প্রাচীরের দিকে ছুটিতেছে। একজন পুরুষ দীর্ঘ বল্লম-আঘাতে অগ্নির ভস্মাচ্ছাদন দূর করিয়া দিল, অমনই লেলিহান আরক্তচ্ছটায় দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীর উল্লঙঘন করিবার পর রুমাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন সে সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া হতবুদ্ধির মতো ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার চারিপাশে সদ্যোত্থিত নারীগণ আর্ত-ক্রন্দন করিতেছে। আমি লাফাইয়া গিয়া রুমার উপর পড়িলাম, তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলম। কয়েক পদ যাইতে

না-যাইতে দেখিলাম, একজন পুরুষ শাণিত দীর্ঘ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। রুমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমি ক্ষিপ্রহস্তে মাটি হইতে একখণ্ড পাথর তুলিয়া লইয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম। মস্তকে আঘাত লাগিয়া সে মৃত্যুবৎ, পড়িয়া গেল। রুমা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া ছুটিলাম।

আমাদের দলের অন্য সকলে তখন প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিতেছে–ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দুই পক্ষেরই মানুষ পড়িতেছে, মরিতেছে— কেহ আহত হইয়া বিকট কাতরোক্তি করিতেছে। আমি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম। সেখানে জীবিত কেহ নাই, কয়েকটি রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দ্বার অতিক্রম করিতে যাইতেছি, এমন সময় রুমা সহসা যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। নিজের কেশের মধ্যে হাত দিয়া সেই উজ্জ্বল বাঁকা অস্ত্রটা বাহির করিল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করিয়া আমার কপালের পাশে সজোরে বসাইয়া দিল।

কপাল হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। তাহার হাত হইতে অস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, তুই আমার বৌ! তুই আমার রুমা! এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমার করে নিলাম! — বলিয়া আমার ললাটতলুত রক্ত হাতে করিয়া তাহার কপালে চুলে মাখাইয়া দিলাম।

ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে— বিপক্ষ দলের একটি পুরুষও জীবিত নাই। আমাদের দলের যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা রক্তলিপ্ত দেহে উন্মত্ত গর্জন করিয়া নারীদের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

শেষ